সংঘাত

শ্রীউমাপদ খাঁ

প্রাপ্তিস্থান :
জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সহরের অনেক বড় বড় বাড়ীর আশে-পাশে খানিকটা জায়গা নিয়ে নীচু টিনের চালের বা গোলপাতার দলবেঁধে গড়ে ওঠা যে সব বসতি আছে, তারই একটী ঘরের মেয়ে স্বপ্না। স্বপ্নার বাবা হরিসাধন দাস, একজন সামান্য কারিগর। নিত্য আয়ের মধ্যেই নিত্য খরচের সীমানা। পরিবারের লোকজন হিসাবে তাঁর স্ত্রী মাধবীদেবী, আর সন্তান-সন্ততি হিসাবে একটী ছেলে ও একটী মেয়ে। মেয়ে স্বপ্নাই প্রথম সন্তান ও বয়স হিসাবে বিবাহ দিবার তাগিদ্ না ঘটলেও মাধবীদেবীর চক্ষু-লজ্জার ভয় তাকে স্কুলের পড়া ছাড়াতে বাধ্য করেছে। ছেলের বয়স মাত্র আট বৎসর। তাই হরিসাধনবাবুর পরিশ্রম করবার দিন বুড়োবয়স পর্য্যন্ত আরও খানিকটা বেড়ে গেছে। কারণ ছেলের উপায়ের প্রত্যাশায় এখন অনেক দিনই বসে থাক্‌তে হ'বে। সপ্তাহের মাঁইনের উপরই সপ্তাহের খরচ কোন রকমে চলে যায়, বিশেষ কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না; থাক্‌লেও সে ছেলের লেখাপড়ার খরচেই কেটে যায়। তবে একদিকে এদের সুখ ছিল, আশে-পাশের বাড়ীর আনাগোনায় বেশ হাসি-ঠাট্টায় দিনগুলো কেটে যেত; ওপরের লোকজনের

সাথে বেশী আলাপ বা ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও, নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রেখে চলবার এরা চেষ্টা করতো। ঘন ঘন নেমন্তন্নর আসর না বসলেও কখনও কখনও কারও বিয়ে বাড়ীতে এদের বেশ সমারোহের সৃষ্টি হতো। কারও একজনের বিয়ে উপলক্ষে প্রায় সকলেই প্রাণ দিয়ে খেটে তাকে দায় থেকে উদ্ধার করতো।

আজ বিল্বষষ্ঠীর দিন। মা দুর্গার আরাধনার ব্যবস্থা নিয়ে ছোট বড় সকলেই আজ আলোচনায় মত্ত। কেউ পাঁজী খুলে এবারে মায়ের কিসে আগমন ও কিসে যাত্রা এই নিয়ে মাতামাতি করছে, কেউ ক'খানা জামাকাপড় পাওনা হোলো ও কত দামে সেগুলো পাওয়া গেল তার হিসাব নিকাশ করছে, কেউ বা এপাড়া ওপাড়া মিলিয়ে কতগুলো সার্ব্বজনীন ও বাড়ীর ঠাকুরের তালিকা হোলো মিলিয়ে দেখছে, কেউ কেউ চাঁদা দিতে দিতে সার্ব্বজনীন পূজোগুলোর মধ্যে চুরি জোচ্চুরী নিয়ে বাপান্ত করছে, কোন কোন জায়গায় সোনার গহনার পরিবর্ত্তে রূপোর গহনা গড়িয়ে দিয়ে অনুরক্ত স্বামী সতী সাধ্বী স্ত্রীর মন রাখছে। পূজার বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে কোন কোন দল কোন কোন দলকে টিটকারি করছে। সমস্ত বৎসরের পুঞ্জীভূত ক্লেশ যেন এই মহাপূজার মধ্যে ছোট বড় সকলকে সম পর্য্যায়ে এনে দিয়েছে। যে যেমন সে তেমন ভাবেই আজ

এই গভীর আনন্দে ছুটাছুটি করছে। পর্ব্ব হিসাবে পূজার সৃষ্টির মধ্যে কি ছিল জানি না তবে ইহাতে শ্রান্ত ক্লান্ত জীবনে গভীর শান্তি যে পাওয়া যায় ইহা সুনিশ্চিত।

বসতির অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মতনই আজ সকাল থেকে স্বপ্নার মনে আনন্দের দোলা লাগে। অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজকের কাজগুলো যেন একটু তাড়াতাড়ি সারা হয়ে যায়। একটু পরেই তাদের বসতির 'নটুদা' কাজ থেকে ফিরে পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঠাকুর দেখতে বেরুবেন, স্বপ্নাও সেই দলের সাথী হতে চায়, তাই কখনও কখনও বেলা কটা বাজলো তার দিকে নজর রাখ্‌ছে। কি জানি নটুদা এসে পড়লো কি না? হঠাৎ কাজ করতে করতে স্বপ্না হোঁচট্‌ খেয়ে টল্‌তে টল্‌তে নিজেকে সামলে নিল। মাধবী দেবী ধমক দিয়ে উঠলেন "কি রে স্বপ্না, তোর কি হুঁশ করে কাজ করতে নেই, এত ব্যস্ত কিসের?" স্বপ্না কোন উত্তর না দিয়ে হাসতে হাসতে সরে পড়ে। বিকালে ভাল করে গা হাত ধুয়ে সাজ-গোজ করবার জন্যে স্বপ্না ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এতক্ষণ মাধবী দেবীর স্বপ্নার হঠাৎ গড়ে ওঠা চাঞ্চল্যের দিকে কোন লক্ষ্য ছিল না, এবারে সাজগোজের বাহার দেখে জিজ্ঞাসা করে উঠলেন "কি রে স্বপ্না, তুই কি কোথাও যাচ্ছিস্‌ না কি?" "হ্যাঁ মা, আজ পূজো দেখতে যাবো।" স্বপ্না জিভ কেটে আড়ষ্ট ভাবে

মায়ের কাছে দাঁড়ায়। "কার সাথে যাওয়া হবে শুনি?" কথাগুলি বলে মাধবীদেবী বেশ রাগত ভাবেই স্বপ্নার দিকে তাকায়। "নটুদার সঙ্গে সবাই ত যাবে, আমিও যাবো।" স্বপ্না উত্তর দেয়। মাধবীদেবী এবার রীতিমত ধমক দিয়ে ওঠেন "না, আইবুড়ো ধেড়ে মেয়ের এইরকম একলা একলা বাইরে যাওয়া চলবে না—বুঝলে? নটুদা এলে আমার নাম করে বোলো যে আমি বারণ করেছি।" কথাগুলো বলে আর অপেক্ষা না করে ব্যস্তভাবে জল আনতে চলে যান। স্বপ্না দুঃখে ও রাগে গড়গড় করতে করতে ঘরের ভিতর ঢুকে বিছানার ওপর ধপাস্ করে বসে পড়ে।

সন্ধ্যা না হোতেই রাস্তায় ভীড় জমা হোয়ে উঠেছে; একা একা, দলে দলে ছেলেমেয়ের দল হাসতে হাসতে এ রাস্তা ওরাস্তায় ঠাকুর দর্শনে চলেছে। এর ওর হাত ধরে নিজেদের দল বজায় রাখবার চেষ্টা করছে, প্রাপ্তবয়স্কর দলও কম নেই। তবে যুবক-যুবতীদেরই বেশীর ভাগ লক্ষ্য পড়ে। নূতন নূতন পোষাক পরিচ্ছদে একে অপরের কাছ ঘেঁসে চলতে সুরু করেছে, মাঝে মাঝে লাইন ঠিক রাখবার জন্য উৎসাহী যুবকের দল রাস্তায় রাস্তায় দড়ি ঠিক করে রাখে। এক আধখানা মটোর গাড়ী ভীড়ের মাঝখান দিয়ে আরোহীদের নিয়ে রাস্তা

সুবাসিত করে চলে যায়। হঠাৎ লক্ষ্য পড়ে—ভীড় ঠেলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে তিনটী যুবক। এরা তিন বন্ধু, মলয় ও তারই কাঁধ ধরে অরুণ আর সত্যেন। পূজার দিনে অনেকে অনেক ব্যাপারেই হাসাহাসি করে, কিন্তু এদের হাসিতে একটু পার্থক্য ছিল। এরা তিনজনেই একই কলেজের সহপাঠী। এই কিছুক্ষণ আগে একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোক পুরুষদের ভীড়ের চাপ দেখে মহিলাদের সাথে চলবার চেষ্টা করছিলেন। একটী ভলান্টিয়ার তাড়াতাড়ি ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সাবধান করে পুরুষদের সাথে ঠেলে দেয়। বৃদ্ধ ভদ্রলোক অনেক অনুনয় বিনয় করলেন, "বাবা আমি তো বুড়ো মানুষ, ও মেয়ে পুরুষ আমার কাছে কোন পার্থক্য নেই।" ভলান্টিয়ারটী একটু রসিকতা করেই বলে যায় "তা আপনি বৃদ্ধ হউন আর যাই হোন পুরুষের চিহ্ন যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আপনাকে পুরুষদের সাথেই চল্‌তে হ'বে," ভদ্রলোক আর কি করেন, মা দুর্গাকে স্মরণ করতে করতে এগিয়ে পড়েন।

আজ মহাষ্টমী। অতি ভোর থেকেই আজ অনেকেই বীরাষ্টমী ব্রত উদ্‌যাপন করার জন্য ব্যস্ত। এতদিন প্রতিমার দিকেই ছেলেদের নজর ছিল, এখন মূর্ত্তি ছেড়ে পূজার সাফল্যে সকলেই চিন্তিত ও কর্ম্মব্যস্ত। যার যা আছে সে সব দিয়েই

আজ সারা বৎসরের মধ্যে একদিন মায়ের কাছে দীক্ষা নিতে চায়। ছোট বড় সকলেই ঐ একই চিন্তায় নিমগ্ন—কি কোরে মায়ের এই মহাপূজা সমাপন করা সম্ভব হ'বে। সহরের এই দিনটি এক মহা উৎসবের দিন। শুধু একান্ত অকর্মণ্য ছাড়া কেউই ঘরের ভিতরে থাকতে চায় না। আজ যদিও সকাল থেকেই আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তবুও মাঝে মাঝে অনেকে আকাশের দিকে দৃষ্টি রাখছে—ঝড় বৃষ্টি যেন না হয়। সমস্ত পূজার পরিশ্রমের সাফল্য ঐ একদিন—যেদিন অগণিত নরনারী পূজা বা ঠাকুর দর্শনে পূজামণ্ডপে আসা যাওয়া করেন—অনেক পুরাতন বন্ধুর সাথে আলাপের সুযোগ ঘটে, অনেক অপরিচিত পরিচিত হোয়ে যায়।

দিনের বেলাই অনেক ছেলে-মেয়ের দলকে চোখে পড়ে—ঐ যে বড় রাস্তার মোড়ে একটী বিরাট সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব—জনতার স্রোত সেইদিকেই বেশী ঠেলে চলে। ঐ ঠাকুরের জাঁক-জমক অন্য ঠাকুরের অপেক্ষা অনেক বেশী, তাই প্রায় সব সময়েই কিছু না কিছু ছেলেমেয়ের দলকে সেখানে চোখে পড়ে। ঢাকী ঢুলী আজ সকাল সকাল আহার সেরে দেহের কখানা হাড় মেলে ধরে একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করে। কাঁসর-বাজানো ছেলেটা একটা আধ-পোড়া বিড়ি বেশ মনের সুখেই টানতে থাকে। সেই দিকে অন্য ছেলেরা এক

একবার ভীড় জমায়, আবার তেমন কিছু না পেয়ে প্রতিমার কাছে ফিরে আসে। এবার নন্দ ভোলাকে ডেকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে ওঠে—"দেখ্ ভোলা দেখ্, সিংহটা কেমন উল্টে রয়েছে—মায়ের পা একেবারে সিংহের পিঠে—কি সুন্দর মানিয়েছে।" ভোলা এবার ঠেলা দিয়ে বলে ওঠে—"ওই দেখ অসুরটা কি বড় রে। মায়ের সঙ্গে সমান সমান, ইচ্ছা করলে যে কোন সময়ে মাকে হারিয়ে দিতে পারে।" নন্দ এবার রীতিমত ভয় খেয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চেঁচিয়ে ওঠে—সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি ছেলে সেই দিকে চেয়ে থাকে "ওই দেখ বিশু পাহাড়ের ওপর মহাদেব বসে আছেন। মায়ের গায়ে হাত দিলে একবার দেখে নেবেন না?" ভোলা প্রতিবাদ ছলে বলে ওঠে "দুৎ নন্দ, তুই কিচ্ছু জানিস্ না, মহাদেবকে এম্নি সাজিয়ে রাখা হোয়েছে,—উনি কখনো মহিষাসুরের সঙ্গে পারেন নাকি? নিজে পারবেন না বলেই তো মাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, বেশী কিছু বলিস্ নে নন্দ, পাপ হবে, মা রাগ করবেন —নে হাত তুলে প্রণাম কর।" সকলেই একসাথে প্রণাম কোরে ওঠে।

হঠাৎ বাহিরে গোলমাল শুনে সকলেই ছুটে সেই দিকে বেরিয়ে যায়। একটী নবীন যুবক ফলের রেকাব হাতে কোরে দাঁড়িয়ে আছে, আর একজন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের

ফল বিতরণ করে চলেছে। ছেলেদের দল সেই দিকে হৈ হৈ কোরে ছুটে চলে। ফল নিয়ে মহা কাড়াকাড়ি লেগে যায়। রেকাবে ফল খুব বেশী ছিল না—তাই অল্প কয়েকজনকে দিতে গিয়েই সব ফুরিয়ে যায়। অনেকে "আমায় দাও, আমায় দাও" বলে চেঁচিয়ে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে আসে। কি জানি কেন হঠাৎ ফল এর মধ্যে ফুরিয়ে গেল! কর্ত্তৃপক্ষ হয়তো অন্য ব্যাপারে মাথা ঘামাতে গিয়ে এদিকে নজর দিয়ে উঠতে পারেন নি—তাই অল্প কয়েকজনকে দেবার মতনই আয়োজন করে রেখেছিলেন। কত খরচ? সবই যদি ফল কিনতে ফুরিয়ে যায় তা হোলে ঠাকুর সাজানো হয় না। আবার ঠাকুরের বিসর্জ্জনও খুব জাঁকজমকে সারা হয় না। ছেলেরা অমন চেঁচায়—ওদের হট্টগোলে মাথা ঘামাতে নেই। সমবয়সীদের মধ্যেই এসব জিনিষ চলতে পারে।

মলয় আজকের দিনটী বেশ মধুর মনে কোরেই উপভোগ করতে থাকে। কি সুন্দর এই শরতের আকাশ। মা আনন্দময়ী আজ কি অভিনব দিনে দশ দিক আলো কোরে বসে আছেন—তাঁরই সৃষ্টির মাঝে আজ আমরা সুন্দর হোয়ে হাল্কা মনে সমস্ত বৎসরের অক্লান্ত শ্রম ভুলে গিয়ে একে অপরের হাত ধরে মাকে আরাধনা করবার জন্য তৈরী হয়ে রয়েছি। মা আমাদের কল্পনার দূরত্বকে সরিয়ে দিয়ে আজ নিজে এসেছেন

আমাদের চোখের জল মুছিয়ে দিতে—আমাদের আশীর্ব্বাদ জানাতে। মনের গোপনীয়তা ভেদ কোরে এমন দিনে আমরা পরম আত্মীয়ার সাথী হোতে চাই। তাই তো! স্বপ্না আজ তার সে সাথী হোতে পারে না কি? বহু জটিল ভাবনা মলয়কে জড়িয়ে ধরে। এই তো গত কয়েক বৎসরে কোন না কোন সময়ে স্বপ্না মলয়ের পাশাপাশি চলেছে। আর সকলের সাথে প্রতিমা দর্শনে বাহির হোয়েছে;—তবে আজ আর কেন সম্ভব হ'বে না? স্বপ্না কি এখন এতই বড় হোয়ে গেছে যে স্বাভাবিক জীবনের চলাফেরায় তার এত বাধা এসে জমা হোয়ে পড়েছে? মনে সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে মলয় ঘরের বাহিরে পা ফেলে। যাবার সময় ইচ্ছা হয় যে একবার স্বপ্নাদের বাড়ীর খোঁজ নেয়, কাকীমারাও তো ঠাকুর দর্শনে যেতে পারেন।

রাস্তায় পা দিতে না দিতেই স্কুলের বন্ধু রথীনের সঙ্গে দেখা। রথীন ছেলেবয়সের বন্ধু, একসময়ে ডিগ্‌বাজী খেতে খেতে স্কুল ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্মীর আরাধনায় লেগে গিয়েছিল। যুদ্ধের বাজারে একটা ছোটো-খাটো কলকারখানা কোরে বেশ দুপয়সা গুছিয়ে নিয়েছে। এখন রথীন আর ছেলেবয়সের সেই গোবেচারা মাথামোটা ছেলে নেই, এখন সে রীতিমত পাকা ব্যবসায়ী। জামাকাপড়ের ঢোল থেকে কথাবার্ত্তার সব কিছুই এখন পাল্টে গেছে। মলয়কে দেখে রথীন আনন্দে লাফিয়ে হাসতে হাসতে

বলে ওঠে "আমি সঙ্গী খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, যাক্ তোকে পেয়ে খানিকটা আশ্বস্ত হ'লাম। আজকের দিনে কি একলা একলা ভাল লাগে?"

মলয়ও বেশ মনের আবেগে বলে ওঠে—"তা ফাঁকা ফাঁকা, একলা একলা মনে হ'বে বৈকি? অনেক দিন তো লক্ষ্মীর আরাধনা করে গেলি, এবার ঘরের লক্ষ্মী এলেই হয়।"

রথীন মলয়ের তামাসাকে বেশ সুস্থ মনেই গ্রহণ করে—মুখ দেখ্‌লে মনে হয় যেন মলয়ের বলাটা অত্যন্ত ন্যায্য। রথীন এবার সগর্ব্বে পরিচয় দেয় "তা মলয়, বাড়ীতে একজন মেয়েছেলের বিশেষ প্রয়োজন হোয়ে পড়েছে—মা কি আর একলা একলা পেরে ওঠেন—বয়স তো হোয়েছে? আর মাকে খাটাতে আমার মন সরে না।"

"বৌ তো আর কাজ করবে না রে? তবে বৌকে দিয়া লোকের প্রয়োজন মিটবে কেমন করে?" কথাগুলো মলয় বেশ ধীর ভাবে বলে রথীনের হাব ভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে চলতে সুরু করে।

"তা দেখ, পয়সা তো কিছু উপার্জ্জন করেছি--হেঁ হেঁ হেঁ। তবে বৌ এলেও তো আর ক্ষতি নেই।" রথীন বেশ হেলে দুলে কথা শেষ করে।

মলয় আরও একটু গম্ভীর হোয়ে বলে ওঠে "তা তোদের

ভাই বরাত ভাল। লেখাপড়া ছেড়ে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করেছিস্। আমাদের যে কি হ'বে, ভগবানই জানেন।"

রথীন এবার মলয়কে উপদেশের সুরে শুনিয়ে দেয় "পয়সা উপায় তো খুব সহজ রে—শুধু Black অর্থাৎ কালোবাজারী কর,—সব ল্যাটা চুকে যাবে, পয়সা উপায়ের আবার ভাবনা? তোরা কেবল লেখাপড়া শিখে ভাল হবার স্বপ্ন দেখিস্। আরে! ভাল হয়েছ কি মরেছ, যত পারো—যে যেমন পারো—কামিয়ে নাও। ভাববার কি আর সময় আছে? আজকাল কি আর কারও সৎ মনোবৃত্তি আছে না কি? ঠকা আর ঠকানো এর পার্থক্য আজ আর কিছু নেই মলয়, কিছু নেই। আছে কেবল সব পেয়ে ভোগ করবার চরম লালসা। না হয় তো নিঃস্ব হোয়ে পথে পথে এর ওর পানে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকানো। মানুষ যেদিন সত্য সত্যই ভাল হ'বে সেদিন আমরাও কি খারাপ থাকবো না কি? এখন বোকার মতন মিছামিছি কেন কষ্ট পাই তাই বল? আমরা মূর্খ, ওসব ভাল-মন্দর বিচার বুঝি না; বুঝি কেবল নিজের সুখভোগের বাঁধা বন্দোবস্ত বানিয়ে রাখতে। ওসব ভাববার জন্য আরও তো অনেক আছে যাঁরা দেশের হিতাকাঙ্খী তাঁরা চির দুঃখের মধ্যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী করুক আমাদের দেশকে। আমাদের মতন দু-চারজন গেলেই বা কি আর থাকলেই বা কি?"

রথীনের যে বলবার এতখানি ভাষা জানা ছিল তা মলয় এর আগে ভাবতে পারে নি। এবার নিজের মনে একটু হেসে নিয়ে রথীনের সহজ ও সরল যুক্তিকে ঢাকবার জন্য একটু জোরে চেঁচিয়ে ওঠে "দেখ রথীন, আজ পূজোর দিন। আজকের দিনে অন্ততঃ ওসব ভাল মন্দ নিয়ে টানাটানি করিস্ নে। বৈষয়িক চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আয় একটু পূজোর আনন্দ করিগে। আজ মহাষ্টমী; কত রকম কতদিকে আয়োজন চলেছে—চল্ একটু বেড়িয়ে আসি।"

রথীন এবার পূজোর কথায় বেশ জোরেই হেসে ওঠে "ওরে মলয়, তুই একেবারে বোকা। পূজোর আনন্দ কার জন্যে কিছু জানিস্? আমাদের পয়সা থেকেই চাঁদা আর সেই চাঁদা নিয়েই এত জাঁক জমক। এই দেখনা ওই যে বড় রাস্তার পূজোটা—ওকি অল্প দু এক পয়সার চাঁদায় চলে? ওখানে অনেক আভিজাত্য—মানে কালোবাজারের অনেক পয়সা—ঢালা আছে। পয়সাতেই আভিজাত্য, ছেলের দলের চাঁদা হোলেই হোল, বেশ একটু 'নেচে খেয়ে ফূর্ত্তি করে ঘুরে বেড়াতে পায়। পূজোর উপরের রূপটার দাম এখন সবচেয়ে বেশী, তাতেই তো আনন্দ। পরের পয়সায় বেশ জাঁকিয়েই আনন্দ করা যায়। ওরা তো জানে না যে এ পয়সা খরচের মালিকরা এই চাঁদা দিয়ে বেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে; কিছু

চাঁদা দিয়ে এক সঙ্গে এতগুলি ছেলের দলকে কিনে ফেলা যায়—একি সহজ কথা? তোর হয়ত শুনে একটু দুঃখ হোতে পারে। যাই হোক, দুঃখ কোরে তো কোন লাভ নেই। চল, পয়সার আনন্দ পয়সা দিয়েই উপভোগ কোরে আসি।"

এবার রথীনের কথায় মলয় মনে মনে বেশ একটু ধাক্কা খেয়ে যায়। মন তার ঘৃণায় বিষিয়ে ওঠে। ছেলেদের এই প্রাণ-ঢালা আনন্দের মাঝে যে এতখানি কুৎসিত জিনিষ লুকিয়ে থাক্‌তে পারে তা মলয়ের একবারও মনে হয় নি। এও কি সম্ভব? কথায় কথায় অনেকখানি পথ অতিক্রম করা হোয়ে গেছে। সামনেই পূজোর বিরাট মণ্ডপ। স্বপ্নার কথা মলয়ের আর মনেই আসে না। বিরাট মণ্ডপটির দিকে মলয় একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। কি সুন্দর আলোক-সজ্জায় সজ্জিত এই মণ্ডপটি। পিছন ফিরতেই মলয়ের চোখে পড়ে এক বিশাল দেহসম্পন্না মহিলা হাসতে হাসতে গাড়ী থেকে অবতরণ করছেন। কতকগুলি যুবক তাঁর অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত হোয়ে উঠেছে।

মহিলাটি রুমাল দিয়ে মুখ মুছে আঙ্গুল দিয়ে কি একটা ইঙ্গিত করলেন। গাড়ীর ড্রাইভার দরজা বন্ধ কোরে এক ধারে এগিয়ে গেল। মহিলাটি এবার আস্তে আস্তে পা ফেলতে ফেলতে হেলে দুলে পূজোর মণ্ডপে প্রবেশ করেন। পূজোর অন্যান্য দর্শকের মধ্যে নিজের বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব বজায় রেখে

যখন মহিলাটি ঠাকুরের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন তখন জনতার মধ্যে বেশ একটু সন্ত্রস্ত ভাব জেগে ওঠে। মহিলাটি এবার একজন কর্ম্মীকে ডেকে হাতের মধ্যে একখানি পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিলেন। যুবকটি অবাক্ হোয়ে হাতের মধ্যে নোটটা নাড়াচাড়া করতে করতে বেশ গদ গদ চিত্তে মহিলার অকাতর দানের প্রতি সপ্রশংস নেত্রে তাকিয়ে থাকে। এবার মহিলাটি একটু হেসে বলে ফেলেন "এটা প্রণামী।" বেশ উৎসুক মনেই মলয় সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষের প্রণামীতে তার মাথাটা যেন বোঁ বোঁ করে ঘুরে উঠলো—এ কি? প্রণামী যত বড়ই হোক না কেন—প্রণামীর ভারে যে কত বড় সম্বর্দ্ধনা লাভ করা যায়—তা মলয়ের বুঝতে বেশী দেরী হোলো না। আভিজাত্যের সঙ্গে কালো বাজারের আজ কিছু প্রভেদ নেই—ঠাকুরের মর্য্যাদাকে ছাপিয়ে উঠেছে দর্শক বিশেষের মর্য্যাদা—সত্যই এটা মনে মনে কৌতূহল না জাগিয়ে পারে না। টাকা-কড়ির প্রতি এই মাত্রাহীন মর্য্যাদা ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে কোথায় গিয়া যে শেষ হবে তা এখনি বলা মুস্কিল।

ঢাকের শব্দ হঠাৎ সমস্ত পৃথিবীকে জাগিয়ে তোলে দেবীর আরাধনায়। মলয় শব্দের গতিকে অনুসরণ কোরে

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে দেবীর শান্ত ও সৌম্য মূর্ত্তির প্রতি। হে দেবী দশভুজা! আজ তুমি একবার মাত্র আবির্ভূত হও— আমাদের এই পার্থিব জীবনের শত গ্লানি মুছে দিতে। একবার তুমি নিজ হস্তে সমস্ত পৃথিবীকে চালিয়ে নিয়ে যাও সেই অনাদিযুগের চির শান্তির মাঝে। আমরা তোমার কৃপায় আবার যেন জেগে উঠি—আমরা যেন বলতে পারি—আমরা মানুষ, তোমার আশীর্ব্বাদকে সঙ্গে রেখে আমরা যেন এই পার্থিব জীবনে সুখের নাড় রচনা সম্ভব করে তুলতে পারি। কল্পনার সাথে নিজেকে জড়িয়ে রেখে, মলয় দুচোখ বুজে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে থাকে। ঢাকের শব্দ আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে আসে।

প্রথম ভূমিকায় স্বপ্নাদের যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেছে সেটা নিতান্তই তুচ্ছ। কালের বিপর্যয়ে স্বপ্নাদের অবস্থা যতই খারাপ হউক না কেন, একদিন ছিল যখন এই দাসেদের প্রতাপ দশ বিশখানা গ্রামের সকলেই জানতো। সহর থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে দাসেদের পুরাতন গ্রাম। গ্রামের প্রতিপত্তি হিসাবে দাসেদের নাম সুবিখ্যাত। শোনা যায় যদি পূর্ব্বপুরুষরা একটু সাবধান হয়ে চলতে পারতেন, তা হোলে তখনকার বংশধরদের আর কষ্ট-করে উপার্জ্জন করতে হোতো না। বসে খেলেই বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যেতো। কিন্তু তখনকার দিনে

হরিসাধনবাবুর পিতামহের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ ও যথেচ্ছাচারে লক্ষীর ভাণ্ডার খুব অল্প দিনেই উজাড় হয়ে এসেছিল। একদিকে যেমন তথাকথিত আধুনিকতার উপর কড়া শাসন চলতো, অন্য দিকে বারমাসের তের পার্ব্বণের ধুমধামে সারা দেশ গম্ গম্ করতো। তাদের বসতবাটীর সামনে দিয়ে কোন পুরুষের পাল্কী করে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এমন কি কোন যুবক যদি অতিরিক্ত মূল্যের সাজ পোষাক পরে সামনে দিয়ে হেটে যেতো, টের পেলে তাকে কৈফিয়তের জালে নাস্তানাবুদ না কোরে ছাড়তো না। পরের উপকার করতে গিয়ে জমিদারদের সাথে বহুবার বহু ব্যাপারে মামলা-মোকদ্দমা, যেন ভাত কাপড়ের সামিল বলেই মনে হোতো। কিন্তু হায়, আজ আর সে প্রতাপ নাই। অধিকাংশ জায়গা-জমিই বিক্রি হোয়ে গেছে, সাক্ষ্য দেবার জন্য পড়ে আছে কেবল পুরাতন আধভাঙ্গা বসতবাড়ীটি, তাও কালের গতিতে ভাগ হোতে হোতে শতধা বিভক্ত। জীর্ণ বাড়ী মেরামত করার সামর্থ্যও আজ আর কোন অংশীদারেরই নাই।

পুরাতন স্মৃতিকে জড়িয়ে রাখবার জন্যেই হরিসাধনবাবুর মাঝে মাঝে গ্রামে আসা। অনেকেই গ্রামে আসে ফসলের ভাগ-বাটরার জন্য, কিন্তু হরিসাধনবাবুকে গ্রামে এসে কেবল খরচের অঙ্ক বাড়িয়েই ফিরতে হোতো, জমিজমা বা কোন ফসলের আশাই তাঁর ছিল না। তাঁকে অধিক সময় নিজের

পকেট থেকেই জমির খাজনা জোগাতে হোতো। সব ছেড়ে দেবার জন্য তার স্ত্রী মাধবীদেবী বহুবার বুঝিয়ে বলেছেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। জমির ওপর এখনও যেন তার নেশা লেগেই আছে। মনে এই আশা ছিল যে একদিন না একদিন তার বংশধরেরা পুরাতন মর্য্যাদা ফিরে পাবে।

মলয় খুব অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে না হোলেও সাধারণ ভাবে অবস্থা মন্দ নয়। মলয়ের পিতা জীবন সরকার চাকুরী জীবনে বেশ উন্নতি করেছেন। ইদানীং বাড়ী ঘর তৈরী করে সংসারটা বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। সংসারে তাঁর স্ত্রী কান্তা দেবী ও একটী মাত্র ছেলে মলয়। মলয় এখন বি-এ ক্লাসের ছাত্র, মেধাবীও বটে। চাকুরী ছাড়া আর অন্য কিছুতে মলয়কে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কিনা এ নিয়ে জীবনবাবু অনেক চিন্তা করে দেখেছেন। এ ব্যাপারে মলয়কেও অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছেন, কিন্তু মলয়ের কোন উৎসাহ না দেখে নিজের উৎসাহ নিভে আসে। ছেলের আর কোন সংস্থান নাই থাক, ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য যে কিছু সঞ্চয় করে রেখে যেতে পারবেন সে বিষয়ে জীবনবাবুর বিশ্বাস ছিল।

হরিসাধনবাবুর বাঁধা চাকুরীর জন্য জীবনবাবুই দায়ী। কারণ জীবনবাবুই অগ্রণী হোয়ে তাদের অফিসের কারখানায় হরিসাধনবাবুর চাকুরী জোগাড় করে দিয়েছিলেন। সেই

অবধি হরিসাধনবাবু জীবনবাবুর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। আপদে বিপদে উভয়ের কাছে উভয়ের যাতায়াতও কম ছিল না। দু-জনার বাড়ী খুব কাছাকাছি না হোলেও অনায়াসেই যাতায়াত করা সম্ভব। সময় বিশেষে চাকুরী-সংক্রান্ত ব্যাপারে হরিসাধন-বাবু জীবনবাবুর কাছে প্রায়ই আসতেন ও সলা পরামর্শ করতেন। অনেক বিষয়েই জীবনবাবু হরিসাধনবাবুকে সাহায্য কোরে যেতেন। অনেক সময় রাত্রিতে কাজ থাকলে জীবনবাবু নিজেই ফেরার পথে হরিসাধনবাবুর বাড়ীতে খবর দিয়ে বাড়ীর লোকজনের চিন্তা দূর কোরে দিতেন। কারিগরী জীবনে যতই অভিশাপ থাকুক না কেন, মান ও মর্য্যাদা বলতে আধুনিক সমাজে যা বুঝায় তার সব কিছুই হরি-সাধনবাবু পেয়েছিলেন ও তাকে সম্মানের সাথে বজায় রেখে চলবার চেষ্টাও করেছিলেন। ভাগ্য বিড়ম্বনায় কারিগরী জীবনকে সহায় করে রাখলেও আচার ব্যবহারে তিনি পূর্ব্ব পুরুষদের রীতি নীতি বজায় রেখে চলবার চেষ্টা করতেন—এইটাই তাঁর কঠিন কর্ম্ম জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল।

মলয় আজ বিকালের দিকে বৈঠকখানায় কি যেন একটা জিনিষ খুঁজতে ব্যস্ত। হঠাৎ গাড়ীর হর্ন বেজে ওঠে। দেখতে দেখতে সত্যেন ও অরুণ হেলে দুলে এসে হাজির। দুজনেই এক সঙ্গে মলয়কে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে "কি রে মলয়,

তোর এখনও দেরী? নে শীগ্‌গীর তৈরী হোয়ে নে।” মলয় কিছুটা যেন অপ্রস্তুত হয়ে বলে—“না ভাই, আমার দেরী নেই, এই আমি তৈরী হয়ে নিলাম বোলে। তোরা যে এত সকাল সকাল আস্‌বি তা জানবো কি করে বল?” “আজকের খেলায় যে ভীষণ ভীড় হ’বে সে খেয়াল নেই বোধ হয়?” অরুণ হাসতে হাসতে শুনিয়ে দেয়। মলয় তাড়াতাড়ি বলে “তোরা বোস্‌, একটু চা খেয়ে নে, আমি এখনি তৈরি হয়ে পড়ছি।” সত্যেন এবার নাছোড়বান্দা হয়ে প্রশ্ন করে “তোর এতক্ষণ কি করা হচ্ছিল শুনি? নতুন কোন বই পড়া হচ্ছিল না, লেখা হচ্ছিল?” মলয় তাড়াতাড়ি বলে ওঠে “না ভাই, একটা Reference কোথায় লিখে রেখেছি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না। যাই হোক আমি আস্‌ছি।”

খানিক পরে তিন বন্ধুই হাসতে হাসতে খেলা দেখার উৎসাহে বেরিয়ে পড়ে। পথে চলতে চলতে সত্যেন মলয়কে জিজ্ঞাসা করে “আচ্ছা মলয়, তোর কোন আত্মীয় তোদের বাড়ীতে আছে না কি?” মলয় এক মুহূর্ত্ত ভেবে নিয়ে জবাব দেয় “কই, না ত?” সত্যেন এবার খানিকটা ইতস্ততঃ করে প্রশ্ন করে “আচ্ছা এই মাত্র যে মেয়েটী তোদের বাড়ীর মধ্যে গেল—” কথার মাঝখানেই মলয় বলে ওঠে “ও! বুঝেছি, আমার এক কাকাবাবু আছেন, ও তাঁরই মেয়ে।” “তোর আবার কাকাবাবু কোথা

হোতে এল ?" অরুণ বেশ গম্ভীর হোয়ে প্রশ্ন করে। "এখানে এক ভদ্রলোক থাকেন তার নাম হরিসাধনবাবু—তিনি বাবার কাছে এক সাথে চাকুরী করেন, এ তাঁরই মেয়ে স্বপ্না।"

তিন বন্ধুই গাড়ীতে উঠে বসে। সত্যেনের মনে যেন আরও কিছু জিজ্ঞাসা করবার রয়ে গেল। তা এখনকার মতন আর জিজ্ঞাসা করা হোলো না।

পড়বার ঘরে বসে মলয় আপন মনে কি লিখে যাচ্ছিল, হঠাৎ মুখ তুলে চেয়ে দেখে, কখন স্বপ্না এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। স্বপ্নাকে দেখে মলয় হাতের কলমটা রাখতে রাখতে প্রশ্ন করে "কি স্বপনবাবু, কখন আসা হোলো ?" স্বপ্নাও ভ্রূকুঞ্চিত অবস্থায় রাগতভাবে বলে ওঠে "ফের আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন ? আর আমি আসবো না।" মলয় স্বপ্নাকে চলে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি শান্ত ভাবে বলে ওঠে "ও। ভুল হ'য়ে গেছে, আর ভুল হ'বে না।" স্বপ্নাও ঘুরে দাঁড়ায়। মলয় জিজ্ঞাসা করে "তারপর, শারীরিক, মানসিক কুশল তো ? কাকীমার খবর কি ?" "মা ভালই আছেন। আপনি ত আর ওদিক মাড়ান না।" স্বপ্না অভিমানের সাথে কথাগুলো বলে। "আজ আমাদের বাড়ী সত্যনারায়ণের সিন্নি ছিল কি না—তাই—তাই" স্বপ্নার হঠাৎ

আসার ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে মলয়কে বেগ পেতে হয় না। তবুও খানিকটা কথা বলার নেশায় স্বপ্নাকে জিজ্ঞাসা করে "এখন থেকেই যে তোমার দেবতার ওপর ভক্তি গাঢ় হ'য়ে উঠেছে স্বপ্না।"—"তা পুজোয় ভক্তি থাকাটা অন্যায় না কি মলয়দা?" জিজ্ঞাসা করে স্বপ্না। "না—সে কথা আমি ঠিক বল্‌ছি না, তবে বয়স বিশেষে ভক্তি গড়ে ওঠে কি না—তাই।" কথাগুলো বলে মলয় স্বপ্নার দিকে তাকায়। স্বপ্নাও সহজ ও সরল ভাবে উত্তর দেয় "তা আপনাদের বেলায় কি হয় তা জানি না। তবে আমাদের সব বয়সেই সমান, জন্ম থেকেই আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে থাক্‌তে হয়।"—কথার মাঝখানে মলয় বলে ওঠে "নইলে শ্বশুর বাড়ীতে গাল খেতে হয়, কেমন?" কথার শেষে দুজনেই হো হো করে হেসে ওঠে।

ছোট খাটো ঘটনার মধ্য দিয়ে দুটী পরিবার বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবেই দিনযাপন করে চলেছে। এদের মধ্যে যে কোন অশান্তি প্রবেশ করতে পারে, এ ধারণা তখনকার মত কারও মনে উদয় হয় নি। কিন্তু ভগবান প্রত্যেক মানুষের জন্য নির্দ্দিষ্ট পথের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সুখের স্নিগ্ধ ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে অপেক্ষা করে আছে রৌদ্র-দিগ্ধ দুঃখের দহন। তাই দুঃখের কঠিন পরীক্ষা কেউ এড়াতে পারে না।

সেদিন সকাল হোতে না হোতেই "হরি বাড়ী আছ না

কি ?" বলে এক বিধবা মহিলা হরিবাবুর বাড়ী এসে হাজির। হরিসাধন বাবু "কে ?" বলে বাইরে এসে অবাক্ হোয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। মহিলাটি সম্পর্কের জের টেনে বলতে সুরু করেন "তোমার নাম ত হরিসাধন গো !" হরিসাধন বাবু ছোট্ট একটী "হ্যাঁ" দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, মনে মনে ভাবেন— কে এই মহিলা ? এবারে সব পরিচয় পরিষ্কার হয়ে যায়। মহিলাটি বলে চলেন "তা তুমি চিন্‌বে কি করে বল, আমি যে তোমার গরীব আত্মীয়, তোমার পিসতুত বোনের ননদ্। অনেক দিন তোমাদের দেখি নি, তাই ভাবলাম শেষ বয়সে একবার তোমার বাড়ী বেড়িয়ে যাই।" কথার মাঝখানে হরিবাবু বাধা দিয়ে বলে ওঠেন "তা বেশ, ভাল করেছেন দিদি, গরীব আমিও, বেড়াতে এসে ভালই করেছেন, আসুন ভেতরে আসুন।"

এতক্ষণে মহিলাটির মুখে হাসি দেখা গেল, সাথে যে ছেলেটী এসেছিল তাকে ইঙ্গিত কর বলে ওঠেন "ওরে মধু, নে তোর কাকাবাবুকে প্রণাম কর।" "না, থাক্ থাক্।" বলে হরিবাবু ছেলেটীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। মহিলা পরিচয়ের ছলে বলে ওঠেন "আ! আমার পোড়া কপাল, একে আর চিনবে কেমন করে ? এই ত আমার সবে ধন নীলমণি, এখন আর আমার আর কে আছে বল ?"

কতকটা হাল্‌কা মনে হরিবাবু মহিলাকে সঙ্গে করে বাড়ীর

ভিতরে প্রবেশ করেন। ছুটীর দিনেও যে ছেলেমেয়েদের ভাল ভাবে খোঁজ খবর নেবেন তার আর উপায় নাই। একটা না একটা কাজ লেগেই রয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও সংসারে খরচের অঙ্ক আর কমাতে পারেন না। ছেলেমেয়েদের জন্যে যে দু'একটা বাজে খরচ করবেন তারও সম্ভাবনা কই? হাত পেতে যে কেউ শূন্য হাতে ফিরেছেন এমন দিন মনে পড়ে না—অবশ্য সামর্থ্যের অনুপাতে।

যে মহিলা এত পরিচয়ের তর্জ্জমা করে হরিবাবুর বাড়ী আশ্রয় নিলেন তাঁর নাম শোভারাণী। ইনি বাল-বিধবা। স্বভাবের পবিবর্ত্তনে তিনি বেশী দিন সংসাবে থাকতে পারেন নি। নিকট আত্মীয় সকলেই বিরূপ, কেহ ছায়া মাড়াতেও লজ্জা বোধ করে। একদিন ছিল যখন তিনি সকলকে উপেক্ষা করে গভীর আনন্দে ও আত্মপ্রসাদে ডুবে থাকতেন, তখন কোন কিছুরই অভাব হয়নি। কিন্তু আজ এখানে সেখানে কোরে অনেক দুঃখের মধ্যেই দিন কাটাতে হয়। কখনো এক জায়গায় চিরস্থায়ী হোয়ে থাকাও সম্ভব হয় না। মনে তার সন্দেহ ও চতুরতার ফল সব সময়েই জেগে থাকে। দেখলে মনে হয় সারা পৃথিবীর মধ্যে যে লজ্জা তিনি পেয়েছেন তার সবটুকুই তার চোখে মুখে প্রতিহিংসা হয়ে ফুটে উঠেছে। সাথে যে ছেলেটী এসেছিল—প্রথম পরিচয়ে মনে হয় ওরই ছেলে, আসলে

কিন্তু তা নয়। কোন এক হতভাগ্য সংসারের ঠিকরে পড়া এই ছেলেটী, আশ্রয়হীন, এখন শোভারাণীর আশ্রয়ই তার একমাত্র সম্বল। বয়স মাত্র পনেরো ষোলো। শোভারাণীও শেষ বয়সের সম্বল হিসাবে একে দিয়ে ফাই ফরমাজ খাটিয়ে নেন। শোভারাণীর মুখে মিষ্টতা ছিল প্রচুর, তাই অল্প কয়েক দিনেই সংসারের সকলে আপনার হয়ে গেল। এখন মাধবী দেবী বা স্বপ্না সকলেই শোভারাণীকে বেশ প্রীতির চোখেই দেখে। সবিশেষ পরিচয় নেবার আর প্রয়োজন হয় না। মাঝে মাঝে চোখের জলে স্নেহের ভাগটা শোভারাণী বাড়িয়ে নিতে কসুর করেন না। গঙ্গাস্নান ও আরও কত আব্দার বেশ আনন্দের সঙ্গেই পূরণ হোতে থাকে। এঁদের ঘনিষ্ঠতা দেখলে মনে হয় মেয়েদের আত্মীয়তার গভীরতা পুরুষদের অপেক্ষা অনেক বেশী।

* * * *

শান্ত পৃথিবীতে সেদিন নেমে এল ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। মানুষে মানুষে সাম্প্রদায়িকতার হানাহানি। ভালমন্দ কারও বিচারের প্রয়োজন নাই। ভিন্নধর্ম্মী হোলেই আর বিপাকে পড়লেই প্রাণ দিতে হ'বে। নিরীহ মানুষকে হত্যা করার পেছনে যে কার স্বার্থ কেমন করে পূরণ হচ্ছে তা বোঝা মুস্কিল। ধূমকেতুর মতন এই দাঙ্গা আজ নেমে এসেছে। কত মা আজ সন্তান-হারা; কত বিবাহিত স্ত্রীর সিঁথির সিঁদূর মুছে গেল। কত

ভগ্নী বিধর্ম্মীর কাছে লাঞ্ছিত হোলো, কত ধন-সম্পত্তি আতস বাজির মতন মুহূর্ত্তের মধ্যে পুড়ে ছারখার হোয়ে গেল। আশ্রয়-হীন আতঙ্কগ্রস্ত কত পরিবার আজ ছিন্ন ভিন্ন হোয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। এতক্ষন হিসাব নিকাশের কারও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যখন রুদ্র মূর্ত্তি শ্রান্ত হোলো তখন দেখা গেল সকলেই হেরেছে ও হারিয়েছে, সাধারণ মানুষের লোক-সানই হয়েছে, কোন পক্ষই জিততে পারে নি। একই মাটীতে যাদের বসবাস, একই ফসলে যাদের অন্ন সংস্থান, তাদের মধ্যে বিভেদের মর্ম্মন্তুদ কি চেষ্টাই না সেদিন হয়ে গেল, সাক্ষ্য দেবার জন্য কেবল পড়ে রইল অজস্র প্রাণের চোখের জল। সেদিনের সেই তাণ্ডবলীলায় চাকুরী রক্ষা করতে গিয়ে হরিসাধনবাবু আততায়ীর হাতে প্রাণ দিলেন। একটা জীবন-দীপ নেবার সাথে সাথে একটা পরিবার একেবারে নিঃস্ব হোয়ে পড়লো। হাজার লোকের কান্নার রোলের সাথে আরও দুটী প্রাণীর কান্না মিশে গেলো। সেদিন স্বপ্নার আছাড় খেয়ে কান্না দেখে অনেককেই চোখের জল মুছতে হয়েছে; সেদিন স্বপ্নাকে দেখে মনে হয়ে ছিল কে যেন প্রতিটী লোমকূপে তীব্র বেদনার বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। সারা শরীর যেন বেদনার অবসাদে অথর্ব্ব হয়ে গেছে, এক মুহূর্ত্তে কে যেন একটি আনন্দ ও চাঞ্চল্যের ঝর্ণা-ধারাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

তবু দিন-রাত্রি কেটে যায়। শোকাতুর পৃথিবী আবার ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। মানুষের মধ্যে সহজ আদান প্রদান আবার আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে। আশ্রয়-হীনারা আবার নতুন আশ্রয়ে নিজেদের ঘর বাঁধবার চেষ্টা করে। ঘরে ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ আবার জ্বলে ওঠে। ব্যাথাতুর প্রাণে আবার আনন্দের মৃদু সঞ্চরণ দেখা যায়। লেনদেনের হিসাব করতে করতে শোকে মূহ্যমান পৃথিবী আবার কোলাহলে মেতে ওঠে।

স্বপ্নার ছোট ভাই অমল একলা বোসে পড়ে চলেছে। সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। স্বপ্না আপন মনে মায়ের পাশে বসে আনাজ কুটছে। খণেক নিস্তব্ধতার পর মাধবী দেবী ধীরে ধীরে স্বপ্নাকে জিজ্ঞাসা করেন "হ্যা রে স্বপ্না, ও বাড়ীর ভাসুরের কাছে গিয়েছিলি?" স্বপ্না হাতের আলুটা কাটা শেষ করে বলে "হ্যাঁ মা, আমি দেখা করে এসেছি, উনি বললেন খুব শীঘ্রই টাকাটা পাওয়া যাবে, টাকা কি আর পাওয়া যেত মা? জ্যাঠামশায়েরই চেষ্টায় সব হোচ্ছে। আচ্ছা মা, এ টাকা ত বাবার মাইনা থেকে জমা পড়তো, তবে জমা টাকা দিতে ওরা কেন গোলমাল করছে?" কথার শেষে স্বপ্নার অজ্ঞাতেই মাধবী দেবীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে; মেয়ের কথার কি উত্তর দিবেন ভেবে না পেয়ে বলে ওঠেন "সবই ভাগ্য স্বপ্না!" কিছুক্ষণ চুপ চাপ থাকার পর আবার বলে চলেন "এখন

টাকাটা দিয়ে তোর একটা কূলকিনারা করতে পারলেই বাঁচি।” স্বপ্না এবার চেঁচিয়ে ওঠে “না, মা তুমি ও টাকাতে আমার বিয়ে দিতে পারবে না, তুমি কেবল আমাকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা দেখছ, অমলের লেখা পড়ায় কত খরচ লাগবে তা তো জানো, আমি তোমাকে এই শেষ বারের মতন বলে দিই মা যেন ও টাকা বিয়েতে খরচ না হয়।” কথার মাঝে কখন যে দুজনেরই চোখে জল গড়িয়ে পড়েছে, কাহারও খেয়াল হয় নাই ; চোখের জল আজকাল যেন একটু কিছুতেই গড়িয়ে পড়ে, হাজার চেষ্টাতেও যেন বাধা মানে না। চোখের জল মুছতেমুছতে মাধবী দেবী বলে ওঠেন “সে কথা তোকে ভাবতে হ'বে না স্বপ্না, যে দুখানা গায়ের আছে সে অনেক কাজে লেগে যাবে।”

স্বপ্না কি বলতে যাবে এমন সময় শোভারাণী এসে দাঁড়ালেন, স্বপ্নার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। শোভারাণী এসে এদিক ওদিক দেখে সিঁড়ির পাশেই বসে পড়লেন। ভাল ভাবে বসে নিয়ে মাধবীদেবীকে সম্বোধন করে বল্লেন “বৌ, আর কতদিন আমরা এখানে থাকবো ?—তাই ভাবছিলাম তোমাদের দুঃখের সংসারে আর বেশী দিন বোঝা হয়ে না থাকাই ভাল, তবে যাবার সময় একটা উপকার করতে পারলে খুসী হতাম—” কথাগুলি বলে একবার স্বপ্নার দিকে চাইলেন। একটু নড়ে চড়ে তার পর আবার বলতে সুরু

করেন "আমার হাতে একটা ভাল পাত্র আছে, যদি তুমি রাজী হও বৌ, তা হ'লে একবার চেষ্টা করে দেখি।" মাধবী দেবী উৎসাহের সঙ্গে বলে ওঠেন "তা আপনি আমার ভালর জন্যই করবেন। স্বপ্নাও আপনার মেয়ের মতন, যদি ওর ভাল কিছু হয় তার চেষ্টা আপনি করেন বই কি ঠাকুরঝি।" শোভারাণী এবার আরও একটু এগিয়ে গেলেন "আমি যা দেখে দেবো বৌ, সে সি আর খারাপ হবে? বলে আমি কতজনের কত উপকারই করলাম, স্বপ্না তো আমার আপনার জন, তার বিয়ে কখনো খারাপ জায়গায় হোতে পারে? তবে ভাই, আর আমি দেরি করবো না, আমি কালই সকালে রওনা হবো, আমাকে একটু গুছিয়ে গাছিয়ে দিও।"—কথাগুলি শেষ করে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ভাইয়ের কথা বলতে বলতে মধুর খোঁজে চলে গেলেন। স্বপ্নাও এ কয়েকদিন শোভারাণীর চালচলনে খুসী ছিল না। তাই কথার শেষে আপন মনে মুখ বাঁকিয়ে বঁটিটি হাতে করে রাগে গর গর করতে করতে উঠে পড়ে।

* * *

"কেরে মলয়, আয় ভেতরে আয়।" সত্যেনের সম্বোধনে মলয় ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে। "তারপর মলয়, এত সকালে কি মনে করে?" সত্যেন অন্যমনস্কভাবেই প্রশ্ন করে।

মলয় পরিপাটী ভাবে সাজানো একটা কোচে বস্‌তে বস্‌তে উত্তর দেয়—"কেনরে সত্যেন, সকাল বেলা কি আসতে নেই ?" হাতে চিঠি লেখা খামটা আঁটতে আঁটতে সত্যেন বলে চলে "না তা নয়, তবে এত সকালে চুপি চুপি এসে পড়লি—" মলয়ের দৃষ্টি ওই চিঠির ওপর, সেই দিকে লক্ষ্য করতে করতে উত্তর দেয়, "তা তোর বাড়ীতে আর কে আছে বল যে কড়া নাড়বো, না হয় স্লিপ লিখে পাঠাবো ? আছিস্ তো কেবল তুই—আর আছে কতকগুলো চাকর-বাকর।" সত্যেন এবার চিঠির খামটা পকেটে পুরতে পুরতে মলয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে বলে "তা মলয়, দেখ, আমি একরকম বেশ ভালই আছি, কোন ঝামেলা নাই, মাঝে মাঝে মন খারাপ হয় না যে তা নয়, স্নেহময়ী মায়ের যে কি আদর যত্ন তা আমার কপালে জোটেনি বটে—" শেষের কথাগুলো একটু আস্তে আস্তে বলতে গিয়ে সত্যেনের গলার স্বর ভারি হয়ে আসে। অসাবধানতায় অন্তরের কোন তন্ত্রীতে গোপন ব্যাথায় আঘাত করে ফেলেছে ভেবে মলয়ও চুপ করে যায়।

সত্যেন রায় বংশের ছেলে, বেশ অবস্থাপন্ন, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে অতি অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন। থাকার মধ্যে সত্যেনের অগ্রজ সহোদর রজনী রায়। কিন্তু তিনিও আজ আট নয় বৎসর দেশছাড়া। সেই যে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে বিলাত

গিয়েছিলেন আর ফেরেন নাই। মাঝে মাঝে দু'একখানা চিঠি যে আসে না তা নয় কিন্তু সত্যেনের চোখের জল আর চিঠির অনুরোধ তাকে কিছুতেই ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারছে না। খুব অনুরোধ-উপরোধের বিনিময়ে কেবল কাগজে কলমে অজুহাত আর সান্ত্বনা ফিরে আসে। এত বড় বিরাট বাড়ীর মালিক একা সত্যেন রায়। ব্যবসা টাকাকড়ি থেকে আরম্ভ করে বাড়ীর সমস্ত ভারই এখন এক সরকারের উপর ন্যস্ত। সত্যেন পড়াশুনা করতেই ব্যস্ত। যখন খুব পীড়াপীড়ি আসে তখন কেবল খান কয়েক চেক্ সই করেই খালাস। বার বার নিঃসঙ্গ জীবনের ব্যথা যে সত্যেন পায় নি তা নয়। এতদিন সে ব্যথা পড়াশুনা আর বন্ধুবান্ধবদের সাথে মেলামেশার মধ্যেই ভুলবার চেষ্টা করেছে। কেবল আজকালই সত্যেন যেন একটু বেশী আনমনা হয়ে পড়েছে।

যাই হোক মলয়কে চুপ করে যেতে দেখে সত্যেন খানিকটা হেসেই প্রশ্ন করে "কিরে মলয়, তুই কি প্রয়োজনে এখানে এ'ল বল্‌লি না ?"

মলয় থতমত খেয়ে উত্তর দেয়, "একটু পরামর্শ করতে এসে-ছিলাম ভাই, তুই যদি মত দিস্ তাহলে আমি ভরসা করে একটা কাজে নামতে পারি।" মলয়ের ধীর ও গম্ভীর কথাগুলো সত্যেন বেশ শান্ত ভাবেই শুন্‌তে থাকে। একটু থেমে মলয়

আরম্ভ করে "দেখ সত্যেন, আমাদের দেশের অবস্থার কথা সকলেরই কিছু কিছু ভাবা দরকার। ব্যক্তিগতভাবে দান-ধ্যানের চেয়ে আমার মনে হয় যুক্তভাবে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারলে ভাল হয়, কারণ, ওগুলোর মারফৎ আমরা সহজেই আমাদের আশেপাশের অনেক গরীব, মধ্যবিত্ত সংসারীর দুঃখ মোচনে সাহায্য করতে পারি। করতে পারলে যে আমাদের দেশের অনেক উপকার হবে তা ঠিক—কি বলিস? এই মনে কর—একটা স্কুল, যেখানে ছেলেমেয়েরা বিনা বেতনেই লেখাপড়া শিখতে পারে। তারপর একটা দাতব্য চিকিৎসালয়, এই রকম বিভিন্ন জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান। তবে একসঙ্গে সব কিছু করবার জন্য বলছি না, আস্তে আস্তে এগুলেই চল্‌বে।" কথার শেষে সত্যেন একটু নড়ে চড়ে বসে নিয়ে উত্তর দেয় "তা তোর উৎসাহ দেখে আমি খুব আনন্দিতই হলাম, কিন্তু বাস্তবের সাথে চলতে গেলে একটু বেশী ভাবা দরকার, মলয়।"

মলয় বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করে "কি রকম?"

সত্যেন এক কাপ চা হাতে চাকরটাকে আসতে দেখে, আর এক কাপ চায়ের ইঙ্গিত করে আবার বলতে সুরু করে "দেখ মলয়, এরকম যে একটা কিছু করা দরকার সেটা আমিও অনেকবার ভেবে দেখেছি। কিন্তু একটু বেশী ভাবতে গিয়েই চুপ করে গেছি। দেশের যে অভাব অনটন আমরা চোখের

সামনে দেখতে পাচ্ছি তা কি কেবল ওই গোটাকতক স্কুলের না আরও অনেক বৃহৎ ব্যাপারের ?"

মলয় বলে ওঠে, "কেন, এখন তো আর দাঙ্গাহাঙ্গামা নাই, এখন আমরা যদি আমাদের দেশকে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করতে না পারি তাহলে দেশ যে অনেক পেছিয়ে পড়বে—"

"দেশকে গড়ে তোলবার জন্য যে আমাদের সহযোগিতা নিতান্ত প্রয়োজন তা আমি মানি, কিন্তু বৈধ নিয়মতন্ত্রের মধ্যে যতক্ষণ না আমরা নিজেদের চালিত করতে পারছি ততদিন এইরকম খাপছাড়া অবস্থায় দেশ চলতে থাকবে; এর আমূল পরিবর্তনের কোন আশাই আমরা করতে পারবো না। দেশকে ভালোবাসতে গেলে, কেবল এক জায়গার কথা চিন্তা করলে চলবে না—মাত্র দু-পাঁচজনের দুঃখ মোচনে দেশের হাহাকার মিটবে না; এই বৃহৎ দেশে যতদিন না আমরা একটা সাধারণ পটভূমিকায় প্রত্যেকের দেনাপাওনা সমানভাবে রেখে নিজেদের গড়ে তুলতে পারছি, ততদিন দিশেহারার মতন এই বিরাট জনসমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে হ'বে। বাস্তব সমাধানে পৌঁছাতে পারবো না। একদিক উঁচু করবার চেষ্টা করলে, আর একদিক ঠিক তেমনিভাবেই নীচু হয়ে পড়বে; নদীর একপাড়ে মাটি জমা হ'লেও আর এক পাড় ধ্বসে পড়বে। তবে এতে অনেকের নাম করার যে সুযোগ মিলবে না তা আমি বলছি না।

শুধু নাম কেন ফুলের মালারও সদ্ব্যবহার হ'বে, খবরের কাগজে অনেক যশের কথা ছাপা হয়ে যাবে, মিটবে না কেবল জনগণের ক্ষুধা।" সমস্ত কথাগুলো বেশ দরদের সঙ্গে বলে সত্যেন আস্তে আস্তে চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইল। তার পর আবার বলে উঠলো "দেখ মলয়, আমি এত কথা বল্লাম—কিছু মনে করিস নে, আমার অঙ্কে যা পড়বে তা জানিয়ে দিস্। আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করবো তোর সে অঙ্ক পূরণ করতে।"

মলয় এবার ধমক দিয়ে বলে ওঠে "তুই ছাড় ওই বড় বড় আকাশ কুসুমের কথা, আমাদের দেশ ভীষণ গরীব ও অশিক্ষিত, এখানে যতটুকু ভাল করবার চেষ্টা করবি ততটুকুই ভাল, খুব বেশী এক সঙ্গে করা যাবে না। আর তা ছাড়া একদিনে কি সব সম্ভব হ'য়ে যাবে? আস্তে আস্তে গড়তে গড়তে তবেই তো সব কিছু পাওয়া যাবে। যার কিছুই সংস্থান নেই—যে কোন কাজেরই নয়—তাকে কি একেবারে রাজা উজির করা যায় নাকি? আর তাই বা কেন, আমাদের অল্পতেই যখন চলে যায়, তখন ওই অল্পটা হোলেই যথেস্ট পাওয়া হবে, তার বেশী কিছু করতে গেলেই অরাজকতা দেখা দিবে, দেশ গড়ার চেয়ে ধ্বংসেরই সৃষ্টি হবে।" সত্যেন এবার বেশ হাসিমুখেই উত্তর দেয় "দেখ মলয়, ভবিষ্যতের উপর যদি

কোন দরদ আমাদের থাকে তো আমাদের মিথ্যে ধ্বংসের ভয়ে পেছিয়ে পড়লে চলবে না, প্রগতির পথেই শান্তি, তবে ইচ্ছাকৃত ধ্বংসের কথা আমি বল্‌ছি না; বাঁচবার লড়াইয়ের মধ্যে যদি কোন ধ্বংস আসে, তাকে আমাদের মেনে নিতেই হবে। কোন কিছু না করে বা কোন কিছু না দিয়ে কোন বড় কাজ সম্ভব হয় না মলয়; দক্ষিণা হিসাবে কিছু রক্ত দিতেই হবে। তাকে বাঁচিয়ে যাওয়ার চেষ্টা আমাদের করতে হবে সত্য, কিন্তু যদি প্রয়োজন হয়ে পড়ে—পেছিয়ে গেলে তো চলবে না। যাক্ মলয়, অনেক বড় বড় কথা বলে ফেল্লাম যা হয়ত তোর আমার পক্ষে অচল। এখন আর কিছু কি বলবি? আমি এক্ষুণই একবার বাইরে যাবো।"

কথা বলতে বলতে দুজনেই অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল। এখন প্রকৃতিস্থ হ'য়ে হাল্কা মনে মলয় বলে উঠলো "জানিস সত্তোন, আমি কেন এসব কথা বলছিলাম? ওই যে স্বপ্না বলে মেয়েটীকে তুই একদিন আমার বাড়ীতে দেখেছিলি তার একটা কূল-কিনারা তো করতে হ'বে? তাই ভাবছিলাম— যদি একটা মেয়েস্কুল গড়ে তুলতে পারি, তা হলে হয়ত— অনেকটা সুবিধা পাবে। একদিকে শিক্ষয়ত্রীর কাজও করে যেতে পারবে আবার সাথে সাথে ছাত্রীও হ'তে পারবে।" সত্তোন

বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করে "সে কি রকম?" মলয় হাসতে হাসতে উত্তর দেয় "তা এমন কিছু নয়, স্বপ্না ছোট ছোট মেয়েদের তো খুব পড়াতে পারবে।—আর যা মাইনা পাবে তাই থেকে নিজেও পড়তে পারবে। আজকাল যা দিনকাল পড়েছে মেয়েদের স্বাবলম্বী না হো'লে তো আর উপায় নাই সত্যেন। আর কিছু না হোক্ বিবাহ বাজারের দুরবস্থা থেকে তো উদ্ধার পাবে।" সত্যেন আস্তে একটা "হুঁ" দিয়ে চুপ করে যায়।

সংসারের কাজ করতে করতে আর কারও তেমন স্বপ্নার ওপর নজর পড়ে না। এমনি এক বয়সে স্বপ্না চলেছে, যে বয়সে কত জনে কত কি স্বপ্নই না দেখে থাকে; স্বপ্নাও কাজের মধ্যে আর তেমন প্রাণ খুঁজে পায় না। কত ঘুমই না স্বপ্নার ব্যর্থ হোয়েছে, কত রাজকুমারের কথাই না স্বপ্নার মনে পড়েছে! কিন্তু বাস্তবের কাছে সবই যেন নিছক্ স্বপ্ন হয়ে পড়ে রয়েছে। গরীবের ঘরে সুন্দরের আরাধনা আর কতদিন সে টেনে বেড়াবে? সুন্দরের উপাসনা তাঁদেরই মানায় যাঁরা সুন্দর সেজে অবাধে সমাজের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পায়। রমণীর পরম কাম্য যে রূপ তাও অভাবের সংসারে ঢাকা থাকে, মাঝে মাঝে যুবকদলের মধ্যে আলোচনার খোরাক জোগায় মাত্র!

যৌবনের ভার কেবলই স্বপ্নাকে আড়ষ্ট করে তোলে, তার বেশী অনুভব করবার অধিকার যেন তার নাই।

হঠাৎ সাইকেলের ঘণ্টা শুনে মুখ ফেরাতেই স্বপ্না মলয়কে সাইকেল থেকে নামতে দেখে হেসে ওঠে। স্বপ্না এই মাত্র গা ধুয়ে জলের কলসা কাঁখে করে বাড়ী ফিরছিল। মলয়কে দেখে কলসীটা ও কাপড়টা ঠিক করে গুছিয়ে নিয়ে একটু লজ্জিত ভাবে বাড়ীর ভেতরে চলে যায়। মলয়ও একটু থম্‌কে পড়ে। পরক্ষণেই মনে মনে হেসে স্বপ্নাদের বাড়ী ঢুকে পড়ে।

মলয় বাড়ীর ভেতর ঢুকে "কাকীমা, কাকীমা" বলে চেঁচিয়ে ওঠে। মাধবীদেবী মলয়ের গলার স্বর বুঝতে পেরে ঠাকুর পূজার জোগাড় বন্ধ রেখে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসেন। এসে মলয়কে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে ব্যস্তভাবে একখানা আসন পেতে দেন। মলয়ও বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করে "কাকীমা, আপনার শরীর কেমন? বেশ ভাল আছেন তো?" মাধবীদেবী করুণ সুরে বলে ওঠেন "আর বাবা, ভালয় ভালয় যেতে পারলেই বাঁচা যায়, যাই হোক তোমার বাড়ীর খবর ভাল তো।" মলয়ও ছোট্ট করে একটা "হুঁ" দিয়ে একবার এদিক ওদিক চেয়ে নেয়। মাধবীদেবী মাঝখানে আরও একটা যে প্রশ্ন করেছেন সেদিকে মলয়ের খেয়ালই আসে না। কেবল জড়িয়ে

জড়িয়ে হাত রগড়াতে রগড়াতে "হ্যাঁ" "না," বলেই চলে যায়।

স্বপ্নার উদ্দ্যেশ্যেই বিশেষ করে এখানে আসা, সেই স্বপ্নাকেই যখন সাম্না সাম্নি দেখা যাচ্ছে না, তখন মলয়ের একটু অন্যমনস্ক হওয়াই স্বাভাবিক।

এতক্ষণেও যখন ঘরের ভিতর থেকে স্বপ্না বাইরে এলো না তখন কাজের কথা পেড়ে মলয় জোরে জোরে বলে ওঠে "জানেন কাকীমা, আমি একটা মেয়েস্কুল তৈরী করছি, তবে খুব বড় স্কুল না হোলেও মোটামুটি ভাবে এখন কাজ চলবে। আর হ্যাঁ, আমি ভাবছিলাম যে স্বপ্নাও যেন সে স্কুলটা দেখাশুনা করে, দেখাশুনা মানে এই নিজেও একটু পড়াশুনা করতে পারবে আর সাথে সাথে ছোট ছোট মেয়েদের একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারবে।" কাকীমা মলয়ের কথায় কি উত্তর দিবেন ভেবে না পেয়ে বলে ওঠেন "দেখ বাবা মলয়, তোমরাই এখন আমার অভিভাবক, তোমরা যা ভাল বুঝবে তাই করবে, তবে মেয়েটার একটা বিয়ে দিতে হবে তো ?" মলয় বিয়ের ব্যাপারে একবারে নতুন, তাই একটু চিন্তা করে নিয়ে বলে ওঠে "তা কাকীমা, যতদিন সে ব্যবস্থা না হচ্ছে, ততদিন তো স্বপ্না স্কুলে দেখাশুনা করতে পারবে ?"

এতক্ষণে বিয়ের কথা কানে আসতেই স্বপ্না তাড়াতাড়ি দরজার পাশ থেকে মলয়কে লক্ষ্য করে কি একটা চোখ রাঙানো ইঙ্গিত করতে করতে বাইরে বেরিয়ে আসে। যতটা ভাবা গিয়েছিল মলয় কিন্তু স্বপ্নার ওপর ততখানি চোখ রাখতে সাহস পায় নি, কি জানি কেন আজকাল মলয় স্বপ্নাকে সামনা সামনি দেখতে লজ্জা পায়।

মাধবীদেবী স্বপ্নাকে দেখে মলয়ের জন্য চা আনবার ফরমাস করেন। মলয় ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলে "কাকীমা, আজ থাক। আর একদিন এসে চা খেয়ে যাবো, আজ ভীষণ কাজ আছে, এই দেখুন না স্কুলটা করবার জন্যে অনেকের কাছে এখনো চাঁদা আদায় বাকী আছে।" কথার শেষে মলয় তাড়াতাড়ি মাধবীদেবীর পায়ের ধূলো নিয়ে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করে।

ইতিমধ্যে অমল ছুটতে ছুটতে এসে মলয়কে জড়িয়ে ধরে— "না মলয়দা, আজকে আপনার এর মধ্যে যাওয়া হ'বে না, রোজ রোজ এসে কেবল পালিয়ে যাওয়া হয়? একদিনও তেমন ধরতে পারি না, আজকে আপনাকে আমার সাথে লুডো খেলতেই হ'বে। নইলে আমি ভীষণ রাগ করবো।"

মলয় অমলের জেদ দেখে ইতস্ততঃ করে; হাসতে হাসতে ভোলাবার চেষ্টাও অনেক করে, ওদিক থেকে স্বপ্নার ধমকও

আসে। কিন্তু কোন ফল হয় না। আব্দার যেখানে বড় সেখানে আর কোন কিছুই চলে না। মলয়ও শেষে রাজী না হোয়ে পারে না। অমল হাসতে হাসতে লুডো পেতে বসে পড়ে।

খেলার মাঝখানে স্বপ্না এক একবার আড়চোখে এদের দেখে যায়। যতবার খেলা হয়, খেলা যেন আর শেষ হয় না; উপায়ান্তর না দেখে মলয় স্বপ্নার উদ্দেশ্যে বলে ওঠে "স্বপ্না, তুমি একটু বসতে পারো? নইলে আজ আর আমার রক্ষে নাই।" স্বপ্নাও কাছে এসে দাঁড়ায়। শেষের খেলাটা সত্যিই বেশ জমে উঠেছে, মলয় বেশ ভাল ভাবেই চাল দিয়ে বসেছে, স্বপ্না বেশ বুঝতে পারে অমল এবার হারবে নিশ্চয়ই, ভাইকে হারতে দেখে আর থাকতে পারে না, তাড়াতাড়ি চাল দেখিয়ে দেয়।

এতক্ষণের খেলায় যে আমেজ আসে নি এখন তা পুরো মাত্রায় দেখা দিয়েছে। দানের আদান প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে চোখেরও আদান প্রদান বেশ হোয়ে চলেছে। স্বপ্না এর আগে কখনও এতখানি পাবার প্রত্যাশা করেনি। এতদিন সে কেবল নিরালার সাধনাই করে এসেছে, আজ সত্য সত্যই সেই মলয় তাকে যেন কি এক গভীর হৃদয়ের বন্ধনে ক্রমাগত কাছে টান্‌ছে। স্বপ্না আনমনা হয়ে ওঠে, এই লুডো খেলার সাথে বিবাহ বাসরের কড়ি খেলার কোন সম্পর্ক আছে কি? আজ

মলয়ও খেলার চালে মাথা ঘামাতে গিয়ে নিজেই ঘাম্‌তে সুরু করে। মনে একটা প্রবল তাগিদ আসে—জিততে তাকে হবেই, এ জিত বহু আকাঙ্ক্ষার জিত। একে শক্ত বাঁধনে সে বাঁধবেই, নইলে জীবনের সমস্ত আনন্দই যেন ফুরিয়ে যাবে।

* * * *

আজকাল সত্যেন আর কলেজ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না,—যতটা মাথা ঘামায় কি সব বাইরের কাজকর্ম্ম নিয়ে। তাই মলয়ের সাথে বিশেষ দেখা সাক্ষাৎও হয় না। সত্যেনের ঘরের আবহাওয়াও আজকাল অনেকটা পাল্টে গেছে, নিত্য নতুন লোকের সমাগম। অনেক মহিলাও সত্যেনের বাড়ীতে ব্যস্ত ভাবে আসা যাওয়া করে। চিঠিপত্রের হিসাব রাখতে রাখতে চাকরবাকর যে একটু রাগও করে না তা নয়, কারণ এতদিন তাদের বেশ আরামের মধ্যেই দিন কাটছিল, এখন অনেক কাজ বেড়ে গেছে। ঘন ঘন জলখাবার আর ফাইফর-মাজ খাট্‌তে খাট্‌তে তাদের দিবা নিদ্রার বেশ ব্যাঘাত ঘটে। যতই কাজ পড়ুক না কেন মুখে কেউ কিছু বলবার সুযোগ পায় না। কেবল মাঝে সাজে যখন একসঙ্গে সকলে জোট বাঁধে তখন সংসারটার প্রসঙ্গে অনেকেই আলোচনায় মত্ত হয়; যারা একটু একটু বুঝতে পারে তারা বেশ উৎসাহ দেখায়, যারা আবার বেশী আরামপ্রিয় তারা কেবল নিজেদের খাটুনির বিচার করে।

সবচেয়ে বেশী মুস্কিলে পড়ে অনেক দিনের পুরাতন গোপীঠাকুর। আগে রান্না নিয়ে তেমন বেশী কেউ মাথা ঘামাতো না। কিন্তু আজকাল রান্না নিয়ে রীতিমত আলোচনা হোতে থাকে। পুরাতন ঠাকুর সত্যেনের বেশী প্রিয়, হলে কি হবে—একটু কালা। মাঝে মাঝে ইঙ্গিতে কাজ সারতে হয়। কিন্তু এমনি মজা, অন্য কেউ ইঙ্গিত করলে তার রাগ হয, ভাবে কানে শোনেনা বলে তাকে নিয়ে ঠাট্টা কবছে, কিন্তু সত্যেন যদি ইঙ্গিত করে ঠাকুব যেন খুসী হয়ে ওঠে।

সরকার মশাইকে অঙ্কর হিসাব নিযে এখন প্রায়ই কাছে ছুটতে হয়, মাঝে মাঝে উপদেশ যে না দেয তা নয, সত্যেন কেবল একটু মুচকি হেসে সকল গুরুত্ব হাল্‌কা করে নেয়।

সেদিন বিকালে সত্যেন ও তার সাথে একটী মহিলা বহু কাগজপত্র নিয়ে টেবিলের সামনে বসে আপন মনে কাজ করে চলেছে! হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মলয় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। মলয়কে দেখে সত্যেন বেশ হাসিমুখেই সম্বর্ধনা জানায। মলয় কিন্তু মহিলাটীকে দেখে বেশ একটু ইতস্তত করতে করতে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে। মলয় এতখানি ভাবতেও পারেনি, রাস্তায় আসতে আসতে ভেবেছিল হয়ত

সত্যেন সিনেমায় গেছে, দেখা নাও হতে পারে। তাই ঘরের এই নতুন আবহাওয়াটাতে বেশ একটু চমক লেগে গেল। এমন কি মনের মধ্যে সত্যেনের জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তাও যে খেলে গেল না তাও নয়। বিশেষ কৌতূহল নিয়েই এবার সে সত্যেনের দিকে চেয়ে রইল।

সত্যেন ব্যস্তভাবে মহিলাটীকে সম্বোধন করে বলে ওঠে "রীতা দেবী, এর সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই, আমি পরিচয় করিয়ে দিই, এ আমার বাল্যকালের বন্ধু শ্রীমলয় সরকার—বেশ উৎসাহী দেশকর্ম্মী।" এবার মলয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে থাকে "ইনি হচ্ছেন মিস্ রীতা সেন—আমাদের পার্টির বিশেষ কর্ম্মিষ্ঠা মহিলা ও আমার সহকর্ম্মিনী।"

কথার শেষে দুজনেই দুজনকেই বিশেষ শ্রদ্ধাভরেই প্রণাম জানায়।

সত্যেন এবার মলয়ের দিকে তাকায়। তার চোখ থেকে যেন প্রশ্ন ঝরে—"মলয়, কি প্রয়োজনে এখানে এলি?" মলয় বলে ওঠে "কি কাজ করছিস্ একবার দেখতে এলাম।"

"তা আসবি বই কি! তবে কাজের মানুষ তুইও তো। তাই বিনা কাজে কি এখানে এসেছিস্?" সত্যেন বেশ ভারিক্কী চালেই কথাগুলি বলে।

এবার মলয়ও সপ্রতিভ হয়ে উত্তর করে "হ্যাঁ, তা কাজ

অবশ্য কিছুটা আছেই, তবে সব সময়েই কি কাজ আর ভাল লাগে সত্যেন? এই দেখনা স্কুল করলে তো পাঁচ-জনেরই উপকার হবে? কিন্তু খোসামোদ করতে করতে জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে পড়লো। যেন আমারই বাপ-মা মরা দায় হয়েছে। বাবা রে বাবা! চাঁদা আদায় করতে জুতোর সুকতলা খয়ে যাবার দাখিল।"

সত্যেনও সরল মনে বলে চলে "তা বড় কাজ করতে গেলে অত অধৈর্য্য হ'লে চলবে কি করে বল?"

সত্যেনের কথাতে মলয় যেন তেমন উৎসাহ পায় না, বলে "অধৈর্য্য কি আর সাধে হই? কেবল ফাঁকি আর আর ফাঁক।"

সত্যেন জিজ্ঞাসা করে "সে আবার কি রকম?"

মলয় এবার খানিকটা চড়া সুরে বলে "কি রকম আর! যে যার স্বার্থ গুছাতেই ব্যস্ত, কেউ চায় নাম, কেউ উৎসাহ দেখায় কেবল মুখে; যার আছে সে বলে আমার নেই, আবার যে দেয় সে নিক্তির ওজনে মেপে দেখে নেয় দান করলে ভবিষ্যতে প্রতিদানের আশা কতখানি। আগেকার দিনে আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা মূর্খ থাক আর যাই থাক তাঁরা এরকম দান করে হাতে হাতে কোন প্রত্যাশা করতেন না, পরজন্মের নামে পুণ্য সঞ্চয় কোরে রেখে যেতেন।

যত দিন যাচ্ছ মানুষ ততই যেন বেশী বৈষয়িক হয়ে পড়ছে, এতে কি আর দেশের মঙ্গল হয় ?”

সত্যেন এবার ঠাট্টা করে শুনিয়ে দেয় “দেশের মঙ্গল হোক আর অমঙ্গল হোক্, তোর তো নাম হচ্ছে ?”

মলয় সত্য সত্যই যেন ফ্যাসাদে পড়ে যায়, একথার কি আর উত্তর দেবে ; তাই কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে ওঠে “আচ্ছা হয়েছ ! এখন তোরা কি করছিস তাই বল ।”

সত্যেন বাধা দিয়ে বলে ওঠে “এ নিয়ে মাথা ঘামানো তোমার চলবে না, এ সব হ্যাঙ্গামার কাজ—লোকের কাছে গালাগালি ছাড়া সুনাম পাবার কোন আশাই নাই। তবে সবার কাছে নয়—তথাকথিত সমাজের ভদ্র সম্প্রদায়ের ও প্রতিপত্তিশালী লোকের কাছে ; সাধারণ লোক আমাদের কাজের তারিফ করে বটে, কিন্তু ওপরের লোকজনদের বেশ ভয় কোরেই চলতে হ'য়। এখন তুই বল, তোর এখানে কিজন্য আসা ? বাকী অঙ্কটার জন্যে না আরও অন্য কিছু ?”

কথাগুলি শেষ করে হাসতে হাসতে রীতা দেবীর দিকে তাকায়।

খানিকটা বুঝে আর খানিকটা বোঝবার ভাণ করে মলয় বলে ওঠে “তা বেশ, এদিকে ভাঁড়ে ভবানী, দেশে অন্ন বস্ত্র নাই—সব শুকিয়ে গেছে আর তোরা সম্মান

ভাগাভাগি করবার জন্য ব্যস্ত। বাকী টাকাটা দিয়ে দে আমি চলে যাই।"

সত্যেন ড্রয়ার টেনে টাকাটা বের করে গোনতে গোনতে বলে, "মলয়, মানুষের বোঝা মানুষই বয়ে বেড়ায়, কিন্তু হিসাবে সেই বোঝা থাকা সত্ত্বেও মানুষ যদি বয়ে বেড়াবার সুযোগ না পায়, তার জন্য দায়ী কে হবে বল্?" কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করবার জন্যে সত্যেন রীতা দেবীর দিকে তাকায়। রীতা দেবী ইঙ্গিত ধরে নিয়ে বলে যান "জমি আর লাঙ্গল থাকতেও তার সদ্ব্যবহার না হোলে, অজন্মা তো আসবেই—এ আর এমন নতুন কথা কি?"

"ও সব বড় বড় ব্যাপারে মাথা ঘামানো আমার কর্ম্ম নয়।" বলে মলয় তাড়াতাড়ি টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। মলয় চলে গেলে, রীতা দেবী বলে ওঠেন "ভদ্রলোক বেশ নিরীহ সরল লোক, কিন্তু জীবনে কোথাও কিছু যেন গোলমাল করে ফেলেছেন বলে মনে হয়।"

সত্যেন এবার রসিকতা করেই বলে ওঠে, "খুব অল্প দিনেই পুরুষদের চিনে নিয়েছেন দেখছি।" কথার গূঢ় ইঙ্গিতে রীতা দেবীর মুখ লজ্জায় রক্তিম হয়ে ওঠে।

সত্যেনের দলের কর্ম্মব্যস্ততা ক্রমেই বেড়ে ওঠে। একসাথে অনেকগুলি জায়গায় ছোট ছোট আকারে আন্দোলন গড়ে

উঠেছে। সুদূর পল্লীগ্রামেও তার ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে। অভিশপ্ত কৃষি জীবনের দুঃখ কষ্ট পৃথিবীর মানুষ আর সইতে চাহে না। তাই সত্যেন, রীতা দেবী ও আরও অনেকে এগিয়ে এসেছে এদের কল্যাণ সাধনের ব্রত নিয়ে।

গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তাঁরা এগিয়ে চলেছে। কোথাও সঙ্গীদের ও কর্ম্মীদের উৎসাহ বাড়ানোর কাজ চলে, আবার কোথাও সুপরামর্শ দিয়ে অল্প স্বল্প বিবাদের মীমাংসার পথ নতুন কোরে দেখিয়ে দেওয়া হয়। খুব ব্যস্ততার মধ্য দিয়েই সত্যেন একের পর আর এক গ্রাম পরিভ্রমণ শেষ কোরে চলেছে। কোথাও যে একটু আধটু গলদ রয়ে যাচ্ছে না তা নয়, কিন্তু সমস্ত কাজ সমাধান করবার সময় এখন আর সত্যেনের নাই। খুব অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাকে সহরে ফিরে আসতে হ'বে। তাই সব শেষে দেউলটী গ্রাম পর্য্যন্ত তার কাজ সীমায়িত করার মনস্থ করে শেষ যাত্রা সুরু করেছে।

বহুদিন যাবৎ এই গ্রামে কেবল সালিশীই হোয়ে আসছে জমির ভাগ বাটরা নিয়ে—একদিকে বিত্তশালী তালুকদার আর একদিকে গরীব চাষী মজুর। এখন আবার নতুন কোরে হাঙ্গামা বেঁধে উঠেছে—সদ্য ফসলের নতুন ধানের ভাগাভাগি নিয়ে। জমি হিসাবে যার বেশী আছে সেই এখন সমস্ত ধানের

অধিকারী। কেবল ভাগচাষী পাবে তার মজুরীর খানিকটা অংশ—যে অংশ তাকে সারা বছরের আধপেটার সম্বল জোগায় মাত্র। গত কয়েক বৎসর রোগের প্রাদুর্ভাবে ও অজন্মার প্রকোপে অধিকাংশ মাঠেই পরিপূর্ণভাবে চাষ করা সম্ভব হয় হয় নাই। এদিকে আবার বাঁধা বন্দোবস্ত—চাষীদের মজুরী-হীন অবস্থায় কাজ চালিয়ে যাওয়া। একদিকে যেমন তারা নিঃস্ব অপরদিকে কাগজে কলমে তাদের মজুরী বাঁধা। ফলন তাকে যে ভাবেই হোক করতে হ'বে—আবাদের জন্য সঞ্চিত বীজ থাক আর না থাক। অশিক্ষিত চাষার জীবন এখন ওই সব জমির তালুকদার বা জমিদারের উপর অনেকখানি নির্ভর করছে।

এই সেদিন একটা সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ করে দেশের মধ্যে বিরাট আন্দোলন হোয়ে গেল। কোন চাষাই আজ আর প্রাণ খুলে কথা বলতে সাহস পায় না। ধানের ন্যায্য অংশ আটকাতে গিয়ে শশী মোড়লের আজ চোখের জল সার হয়েছে। বঙ্কিম, কমল চাটুয্যের জমিতেই আজ প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ শশী মোড়ল চাষ করে আসছে। এতদিন সংসারের স্বচ্ছলতায় শশীর কোন চিন্তাই ছিল না। এখন সংসারে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে চাষের ভাগে যা পায়, তাতে করে প্রায় আধপেটাই রোজ হোয়ে

ওঠে না। তাই দাদন ছাড়াও শশী চাটুয্যেমশায়ের কাছে এবার আরও কিছু বেশী ধান চেয়ে নেবে—এইটাই আশা করেছিল। কারণ, অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এ বৎসরে ফসলের পরিমাণ একটু বেশী।

শশী নিত্য অভ্যাসমত সকালের তামাক খাওয়া শেষ কোরে মাথায় একটা গামছা বেঁধে মাঠের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। মাঠে ধানের গাদার কাছে চাটুয্যে মশায়ের দারোয়ানকে মোতায়েন দেখে শশী মোড়ল একটু বিস্মিত মনেই এগিয়ে আসে।

কাছাকাছি হোতেই শশীকে উদ্দেশ্য কোরে দারোয়ান খইনীটি মুখে পুরে দিয়ে বেশ মেজাজের উপর হাঁক দিয়ে বলে ওঠে "এঃ শশী, ধান আভি ঝাড়া নে-ই হোগা। বাবু তুমকো আভি বুলা রাহা। চলো, পহেলা উধার চলো তব পিছে এ কাম হোগা—সমঝা ?" প্রথম মুখেই বাধা পেয়ে শশী খানিকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাটুয্যে মশায়ের বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো।

নিত্য অভ্যাসমত চাটুয্যে মশাইকে প্রণাম কোরে দাঁড়াতেই চাটুয্যে মশাই বেশ হেঁকেই বলে ওঠেন "ওহে শশী, ধান তো এবার মাড়াতে হ'বে—কিন্তু দেনা পাওনার হিসাব ঠিক্ রেখেছে তো হে ?"

শশী এবার বেশ বিনীত হোয়েই উত্তর দেয় "তা দেখুন চাটুয্যে মশাই, আমি তো গরীব, এবারের মতন যদি আপনি দয়া করে আগেকার পাওনাটা না কেটে নেন তো বেশ ভাল হয়। ছেলেপুলে নিয়ে দুমুঠো তবু খেতে পাই ; মা লক্ষ্মী এবার তো বেশ সদয় হয়েছেন।" কথার মাঝেই চাটুয্যে মশাইয়ের পায়ে হাত ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাবু বলা অপেক্ষা চাটুয্যে আখ্যা চাটুয্যে মশায়ের বেশ গৌরবজনক মনে হয়, তাই শশীর দিকে বেশ বড় বড় চোখ কোরে গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে থাকেন—"তা দেখ শশী, তুমি তো কতবার এইরকম নিয়ে আসছো, তবে তুমি যে ফেরৎ দাও তা আমি ব্রাহ্মণ হোয়ে অস্বীকার করবো না। তবে কি জান, এবারে ধানের দামটা একটু উঠ্‌তে পারে, তাই—মানে এমন কিছু নয়, ভাবছিলাম এবারের মতন তুমি যদি একটু রয়ে সয়ে ধানটা পাও তো ভাল হয়।"

সংসারের নিত্য চাহিদার কথা শশীর মনে পড়ে যায়—ভাবতে গেলেও যেন তার সর্ব্ব শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে—তাই এ কথায় সায় দেওয়া তার কাছে অসম্ভব। এদিকে আবার নায্য-মত চাটুয্যে মশাই জমির-মালিক। কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা বড় জ্বালা!—হোলোই বা সে গরীব চাষী মজুর, নিজের রক্ত দিয়ে সৃষ্টি এই ফসল থাকতেও তাকে শুকিয়ে মরতে হ'বে

নাকি ? তাই চাটুয্যে মশাইয়ের কথার প্রত্যুত্তরে বেশ জোর দিয়েই বলে ওঠে "দেখুন, ভগবান আপনাদের অনেক দিয়েছেন, আপনাদের অন্নের অভাব হয় না—কিন্তু আমরা যে মারা পড়ি। আমাদের তো বাঁচাতেই হবে—নইলে যাবো কোথায় ?"

এতক্ষণ চাটুয্যে মশাই লাউ গাছের ডগাটা কেমন বেড়ে চলছে সেই দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। শশীর শেষের কথার উপর বেশ ধমক্ দিয়েই বলেন "শশী, ওসব পেনপেনানী আমার ভাল লাগে না। আমি অনেক দেখেছি ! এখন বুঝতে পেরেছি যে তোমরা দল পাকাচ্ছো। সহরের বাবুরা যা আসা যাওয়া করছে—আমি কি আর বুঝি না যে ওই ওরা এসেই তোমাদের মাথা চিবোচ্ছে। তোমাদের তো এ অবস্থা হবেই, তা ছাড়া তোমাদের বাড়ীর মেয়েদেরও না ভিক্ষে করতে হয়—বুঝলে ? কই আগে তো কোনদিন তোমরা এরকম করতে না ? এখন বুঝি ডানা গজিয়েছে ? যাই করো ওসব মামুলি কথায় আমায় ভোলাতে পারবে না। ধানের সব হিসাব আমার চাই-ই। তুমি মাগ্ ছেলে নিয়ে পথে বস্‌লে তাতে আমার কি ? মনে পড়ে না সেই ওপাড়ার কড়ে ছুঁড়ি রাণীটাকে নিয়ে আমার কি বদ্‌নামটাই না রটালে ? হুঁ হুঁ বাবা, এখন বাগে পেয়েছি ; এখন গলা চেপে সব আদায় করবো।"

শশী মোড়ল সত্যই নিরীহ, গ্রামের কোন কিছু গোলমালে

সে মাথা ঘামাতো না—তার মতন শান্ত স্বভাব ব্যক্তি খুব কমই চোখে পড়ে। হঠাৎ যেন কি হোয়ে যায়। চাটুয্যে মশাইয়ের শেষের কথায় শশী ধৈর্য্যহারা হয়ে পড়ে। এর আগে কোন দিন তার এ অভাব দেখা দেয় নি,—আজই সে এ বিপাকে পড়েছে, সংসারের লোক জন বাড়ার সাথে সাথেই আজ তার এ দুর্দ্দশা। কিন্তু ভগবান সংসারে যাদের পাঠিয়েছেন তাদের কি সামান্য খেয়ে পরে বাঁচবার অধিকারটুকুও রাখেন নাই ?

সমস্ত হিসাবই যেন আজ ওলট পালট হোয়ে যায়। ক্ষণেকের মধ্যে পাগলের মতন শশী চাটুয্যে মশাইয়ের পা জড়িয়ে ধরে। গলার স্বরও চোখের জলে ভারী হোয়ে আসে "দেখুন চাটুয্যে মশাই, আমাকে আর শাস্তি দেবেন না। আমার ছেলেপুলে না খেতে পেয়ে মারা পড়বে। একটু দয়া করুন বাবু।"

বেশ বিরক্তির মধ্য দিয়েই চাটুয্যে মশাই পাষাণের মতন শশীকে ঠেলে ফেলে দিয়ে গর্জ্জে ওঠেন "না—না—না। ওসব বুঝি না, কে মরবে আর কে বাঁচবে এ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এখন আমার নাই। যাও, যা বল্লাম তাই করগে। বলে,—নিজের ছেলেদের সুখশান্তি দেখতে পারলাম না তা আবার পরের ছেলের—হুঁ।"

কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে বিভ্রান্তের মতন শশী

মোড়ল এক কাণ্ড কোরে বসে। চাটুয্যে মশাইয়ের কথায় যে বিষ ছড়ানো ছিল তা শশীর বুকে শেলের মতন বিঁধতে থাকে। পাশেই সদ্য কেটে গুছিয়া রাখা আমের কাঠ জমা হয়েছিল। দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় চাটুয্যে মশাইকে ফিরতে দেখে শশী ওই কাঠ তুলে নিয়ে উন্মাদের মতন মাথায় বসিয়ে দেয়।

আচম্কা এত জোর আঘাত সহ্য করতে না পেরে চাটুয্যে মশাই "বাপ্‌রে" বলে ভূতলশায়ী হোয়ে যান। রক্ত সমস্ত শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। শশীও নিশ্চল দেহ নিয়ে হত-বাকের মতন এই অঘটনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। কে যে তাকে এ কাজ করালে সে আর ভাবতে পারে না।—কই কোন দিন তো কারও গায়ে হাত তোলা দূরের কথা কাউকে কখনও সে কোন শক্ত কথাও বলেনি! তবে কেন আজ সে একাজ করলো?

নিজ কর্ম্মের অনুশোচনার মধ্যে শশী প্রস্তর-মূর্ত্তির মতন দাঁড়িয়ে থাকে—কেবল দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে আসে। অনেকেই চীৎকারের সঙ্গে ছুটাছুটি কোরে এগিয়ে আসে। শশীর কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নাই—পালাবার কোন চেষ্টাই তার স্মরণ হয় না।

তার পরের ঘটনা অতীব পরিষ্কার। শশীকে বেশ পিঠ-

মোড়া বেঁধে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। শশীর বড় ছেলে শ্রীকান্ত থানায় জামীনের জন্য অনেকবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এখন শশীকে বিনা সর্তে হাজতে বাস করতে হ'বে।

আইনের চোখে ধূলো দেওয়া বড় শক্ত। বিশেষ করে সম্ভ্রান্ত কমল চাটুয্যে স্বয়ং যখন এভাবে আহত হোয়েছেন। বলা বাহুল্য, চাটুয্যে মশায়ের এ আঘাত সামলে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। অল্প কয়েক দিনেই বেশ সুস্থ হোয়ে শশীর কঠিনতম শাস্তির সুব্যবস্থা করতে থাকেন।

গাদার ধান প্রায় সবই এখন চাটুয্যে মশায়ের খাস দখলে। শ্রীকান্ত অনেকবার কাকুতি মিনতি জানিয়েছে ন্যায্য প্রাপ্য দিয়ে দিতে, কিন্তু ফল হয়েছে বিপরীত। বড়দের পাপে ছোটদের শাস্তি ভোগ করতেই হ'বে, কোন উপায় নাই। এমন কি আস্তে আস্তে ঘরের দাওয়ার কখানা তালগাছের ঠেক্‌না দেওয়া কাঠ পর্য্যন্ত কমল চাটুয্যে শশী মোড়লের ঘরের চাল ভেঙ্গে বের কোরে আনতে ভোলেন নাই। দাম দিয়ে ও কাঠ কিনে নেবার ব্যবস্থাই একরকম হোয়েছিল, কিন্তু আর্থিক দুরবস্থায় শশী দামটা দিয়ে উঠতে পারে নি, তাই চাটুয্যে মশাইয়ের কাছে এতদিন ঋণী হোয়েই পড়ে রয়েছে ;—যদিও একবার পুকুরকাটার হেফাজতের মধ্যে ও-কাঠের মূল্য ছেড়ে দেবার কথাও যে না হোয়েছিল তা

নয়। তবে আজ আর কোন কিছু ছাড়বার কথাই উঠ্‌তে পারে না। সমস্ত হিসাব নিকাশ চুকিয়ে নিয়ে চাটুয্যে মশাই শশী মোড়লের দুর্দ্দশা দেখতে চান—দেখতে চান যে ওর ছেলেমেয়েরা পথের কুকুরের মতন এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে কিনা?

সেদিন গ্রামের আর একজন পাকা মাথা বঙ্কিম মুখুয্যেকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে উৎসাহভরে বলে ওঠেন "দেখেছো হে বঙ্কিম, দেখো তো ছোট লোকের কীর্ত্তি, আস্কার পেয়ে যেন ব্যাটারা মাথায় উঠে বসেছে, যত বড় মানুষ নয় তত বড় কাজ। ব্যাটাকে একবার দেখে নেবো না!—ব্যাটা কি করে পায়ের জুতো ছেড়ে ওপরে ওঠে।"

বঙ্কিমবাবুর বুঝতে দেরী হয় না যে কাকে উদ্দেশ্য করে চাটুয্যের এ দম্ভ। দোষে গুণে মানুষকে বেশ সরল ভাবেই এতদিন বঙ্কিমবাবু দেখে এসেছেন। মানুষের মধ্যে যে কোন পার্থক্য থাকতে পারে এমন ভাবনাকে তিনি এতদিন মনের মধ্যে কখনও প্রশ্রয় দেন নাই। এর জন্য যে তাঁকে অনেকবার সমাজপতিদের চেষ্টায় একঘরে হোয়ে থাকতে হোয়েছে তাও সত্য। কিন্তু একা লোক বিশেষ সুবিধা না করতে পেরে তাঁকেও এই আজকের মতন "হ্যাঁ, না" করেই অনেক ব্যাপারে সরে পড়তে হোয়েছে। নিজের ক্ষতি সামলাবার মতন শক্তি আজ আর তাঁর নাই।

হঠাৎ এ কাণ্ড ঘটে যাবার পরেই গ্রামের মধ্যে একটা থম্ থমে ভাব দেখা দিয়েছে। কোনকিছুর আলোচনায় আর কেউ সাড়া দেয় না। কি জানি, আবার যদি কারও ভাগ্যে দুর্ভোগ থাকে? সত্যেনের আবির্ভাবে এর কোন পরিবর্ত্তন হয় বলে মনে হয় না।

আজ কয়েক দিন হোলো সত্যেন গ্রামে এসেছে, কিন্তু গ্রামের ছোট বড় সকলের হাবভাব দেখে সত্যেন অবাক হোয়ে যায়। যত অল্পে কাজ সারা হোয়ে যাবে বলে মনে হোয়েছিল এখন আর তা হোয়ে ওঠে না। সহরে জরুরী সভা অহ্বান করার কথা ক্ষণেকের মধ্যে কেবল মনে পড়ে। পরক্ষণেই এ গ্রামের আবহাওয়ায় সব উৎসাহ যেন নিভে আসে। তারই হাতে গড়া এই দেউলটী গ্রামের সংগঠন, এত অল্প কয়েকদিনে যে ভেঙ্গে পড়বে এ স্বপ্নাতীত। দুঃসংবাদের খবর নিতে গিয়ে সত্যেন একে একে সব ঘটনা উদ্ধার করে।

সব খবর চাপা থাকলেও দুঃসংবাদের খবর কখনও চাপা থাকে না। ইতিকর্ত্তব্য ঠিক করে নিয়ে সত্যেন বেশ দৃঢ় চিত্তেই এগিয়ে চলে চাটুয্যে মশাইয়ের কাছে—কোন মীমাংসায় আসা যায় কিনা। কিন্তু ফল ঘটলো অন্য রকমের। চাটুয্যে মশাই সত্যেনের প্রস্তাব তো মানলেনই না উপরন্তু

বেশ কর্কশ কণ্ঠে শাসিয়ে দিতেও ভুললেন না। সত্যেন একান্ত নিরুপায় হয়ে গ্রামের অন্যান্য লোকজনের সাথে আলাপ আলোচনা করে শশীর দুঃস্থ সংসারের সাহায্যের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়ল। দু একজন ছাড়া এ ব্যাপারে সকলেই গা ঢাকা দিল। সকলেরই আশঙ্কা—কি জানি শশীর ভাগ্যের সাথে তাদের ভাগ্য না জড়িয়ে পড়ে! চাটুয্যে মশায়ের কোপ-দৃষ্টি এড়ানো তো আর সহজ নয়।

সত্যেন এই খানেই বেশী বিপদে পড়ে যায়—এক দিকে এতগুলি ছেলেমেয়ের ভরণপোষণের ভার আবার অন্য দিকে শশী মোড়লের বিচারে হাঙ্গামা। বেশী চিন্তায় কোন ফল হবে না জেনে সত্যেন আর রীতা দেবী স্বচক্ষে সমস্ত অবস্থা নিরীক্ষণ করার জন্য শশী মোড়লেব বাড়ী এসে হাজির হয়। শ্রীকান্ত এদের নিয়ে যে কি কববে ভেবেই আকুল—কি করে এঁদেব সম্বর্দ্ধনা জানানো ঠিক হ'বে তার ব্যবস্থা করতে গিয়ে ছুটাছুটি লাগিয়ে দেয়। একে নবাগতা আবার বিদেশী। যথাযথ সম্মান দেখানোর প্রয়াসে শ্রীকান্ত হিমসিম খেয়ে যায়। শ্রীকান্তের হন্ত দন্ত অবস্থা দেখে সত্যেন বাধা দিয়ে দাওয়ার একপাশে মাটীতেই বসে পড়ে। সত্যেনের স্বচ্ছন্দ গতিবিধিতে সবাই আকৃষ্ট হয়। এ বাড়ীর খুব ছোট ছেলে 'অনু' আধো আধো কথা বলতে বলতে

সত্যেনের কোলে বসে পড়ে—যেন কত দিনের কত মিত্রতাই রয়েছে।

সত্যেন মনুর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে শ্রীকান্তকে জিজ্ঞাসা করে "এখন কি করবে কিছু ঠিক কোরে রেখেছ? খাওয়া পরার যোগাড় ঠিক আছে তো?"—সত্যেন আগে থাকতে সব ব্যাপার শুনলেও আসল অবস্থা জেনে নিতে চায়। শ্রীকান্ত কেবল মিনতি-ভরা চোখে সত্যেনের কথা শুনতে থাকে। পায়ের বুড় আঙ্গুলের নোখ দিয়ে মাটি খুঁটতে খুঁটতে চোখ নীচু রেখে আস্তে আস্তে বলে যায় "দেখুন, আমাদের গোলা তো অনেক দিন শূন্য পড়ে আছে, ধানের বালাই নাই,—কি যে করবো?—" সাথে সাথে দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে আসে।

মাঝখানে রীতাদেবী কখন ঘরের অবগুণ্ঠনের মধ্যে মিশে গেছেন কারও খেয়াল ছিল না। রীতাদেবীকে দরজার বাহিরে পা ফেলতে দেখেই সত্যেন জিজ্ঞাসা করে—"কি রীতাদেবী, বেশ জমিয়ে নিলেন তো?" রীতাদেবী প্রত্যুত্তরে কেবল অন্য দিকে চেয়ে চোখের জল মোছেন। ঘরে যারা আছেন তাদের অবস্থা উপলব্ধি করতে সত্যেনের আর বেগ পেতে হয় না। কোন কথা আর না বাড়িয়ে সত্যেন শ্রীকান্তর হাতে কিছু টাকা দিয়ে উঠে পড়ে। আসবার সময় চিঠির ঠিকানা পর্য্যন্ত দেওয়া হোয়ে যায়—প্রয়োজনে লিখে জানাবার জন্য।

পথে চলতে চলতে সত্যেন ঠিক কোরে নেয়—আর একবার তাকে এ গ্রামে আসতে হবে। এবার আসার উদ্দেশ্য হ'বে জ্ঞান দিয়ে অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করার চেষ্টা। এদের সত্যই কোন কিছু করতে হোলে চাই ছোট বড় সকলের মধ্যে শিক্ষার আলো। বিনা শিক্ষায় যতবড় সংগঠনই গড়ে উঠুক না কেন বনিয়াদ কোন দিনই পাকা হবে না। নিজেদের কাজ নিজেরা ঠিকনা করলে অপরে বাইরে থেকে এসে করে দেবে এ একেবারে অসম্ভব।

অস্তমিত প্রায় সূর্য্যের দিকে লক্ষ্য করতে করতে গ্রামের প্রশস্ত পথ দিয়ে সত্যেন আর রীতাদেবী পাশাপাশি এগিয়ে চলেন। এদের নির্ভীক পদক্ষেপে অনেকের মনেই যে শ্রদ্ধা জেগে ওঠে না তা নয় কিন্তু ওই পর্য্যন্ত। এর বেশী জানবার সাহস এরা পায় না। নিজেদের অজ্ঞানতা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না। প্রকৃতির বাঁধা নিয়মের মধ্যেই এদের চলাফেরা। কখনও কোন হাল্কা আনন্দে পরস্পরের কাছে আসা যাওয়া করে বটে কিন্তু, যখন দুঃখ আসে তাকে সইবার মতন ক্ষমতা এদের থাকে না। এরা না পারে প্রবঞ্চনা করতে—আর না জানে ঠিক মতন আনন্দ জানাতে।

স্নিগ্ধ বাতাসে মাঠের আল ধরে এগিয়ে চলে সত্যেন ও সত্যেনের দলের লোকজন। প্রত্যেকের কাছে কিছু না কিছু

জিনিষ রয়েছে—কারও কাঁধে কাপড়ের থলে ঝোলানো, আবার কারও হাতে চামড়ার ব্যাগ—দেখলে মনে হয় যেন তীর্থযাত্রীর দল পাহাড়ের পথ বেয়ে নেমে আস্‌ছে। সত্যেন আর রীতাদেবী ছাড়া আর সবাই এগিয়ে চলে একটু দূরে লম্বা লম্বা পা ফেলে।

"রীতা দেবীর নিশ্চয়ই পল্লীগ্রাম ভাল লাগে নি?" সত্যেনের এই আকস্মিক মন্তব্যে রীতাদেবী একটু এদিক ওদিক দেখে নিয়ে মুখের ওপর উড়ে পড়া চুলগুলো হাত দিয়ে কানের পাশে সরিয়ে দিতে দিতে একটু কটাক্ষ দৃষ্টিপাতে শুনিয়ে দেন "তার মানে? কোনদিন কি কোন কাজে আমার উৎসাহের অভাব হয়েছে?"

সত্যেন আরও দু এক পা এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে বলে যায় "না, আমি ঠিক সে কথা বল্‌ছি না। তবে—এত কষ্ট করার সার্থকতা কোথায়? একি কেবল নিছক দেশসেবা না আরও অন্য কিছু?" রীতাদেবী এতদিন মনে মনে যে কামনার ছবি এঁকে এসেছেন তার আলোচনার এমন সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট না কোরেই বলে ওঠেন "জানি না কে আমাকে এ পথে এনেছে। সেবার আদর্শ আমার কাছে অনেক বড় হোলেও যে কোন সময়েই তাকে পাওয়া সম্ভব হ'বে। কিন্তু আর যিনি আমার মনের গভীরে ধরা পড়েছেন তিনি যে একজন দুর্লভ বস্তু তা আমি জানি।"

কোনদিন এরকম সোজাসুজি আলোচনার সুযোগ আস্‌বে কি না জানা নাই। আজ যখন এসেছে তখন রীতা দেবীর আয়ত্ত চোখের প্রতি লক্ষ্য রেখে সত্যেন বলে চলে "তা হোলেও এটা তো ঠিক যে আমাদের মধ্যে কর্ম্মজীবনে যত সাহচর্য্যই আসুক না কেন ব্যক্তিগত দূরত্ব এ পর্য্যন্ত কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে না।"

এতক্ষণে একটী মোড় ফিরতে গিয়ে দুজনে মুখোমুখী হোয়ে যায়—রীতা দেবীর মুখ লজ্জায় রক্তিম হোয়ে ওঠে। তবুও আজকের এই প্রসঙ্গ রীতা দেবীকে পাগল কোরে তোলে। রীতা দেবী প্রশ্ন করেন "তবে কি বুঝবো যে আপনি পাষাণ ?" নিজের দুর্ব্বলতার সাড়া পেয়ে সত্যেন অস্বস্তির মধ্যে বলে ওঠে "পাষাণ আমি নই রীতাদেবী, যে সাধারণ নিয়মের বাইরে থাকবার আমি চেষ্টা করছি তা কেবল আপনাকে এড়াবার জন্য নয়। কোন উদ্ভট চিন্তার মধ্যে আমি নিজেকে কোন দিনও ধরে রাখি না,—এ শুধু সংযম ও শক্তির পরীক্ষা দিয়ে কালের সাথে লড়াই করা। যে যুগে আমরা পরস্পরকে জানবার সুযোগ পেয়েছি সে বড় কঠিন যুগ। এ যুগে ব্যক্তিকে ডুবিয়ে দিতে হবে সামাজিক প্রয়োজনের যূপকাষ্ঠে। একার ভুলে আমরা অনেকেই পেছিয়ে পড়বো—যদি কোনদিন সে সুযোগ আসে আমরা আবার মিলবো, শুধু মিল্‌বে নয় রীতা, এমন ভাবে

নিজেদের বেঁধে রাখবো যেন কোন দিনও সে বাঁধন না খসে পড়ে।”

কথার মাঝে রীতাদেবী যেন নিজকে হারিয়ে ফেলেন—কখন চোখের জলে গলায় কাপড় দিয়ে পায়ের ধূলো তুলে নেন, সত্যেনও যেন টের পায় না। পরক্ষণেই সত্যেন রীতা দেবীকে ধরে দাঁড় করিয়ে দেয় “ছি! রীতা, আমাকে আর দোষী কোরো না। আমার অন্তরের সমস্ত অজানাকেই তো তুমি আবিষ্কার করে ফেলেছো, আর আমায় এ ভাবে কাছে টেনো না। আমার সমস্ত সাধনা থেকে আমি যেন সরে না আসি, যে কঠিন সংযম একদিন তুমিই আমাকে শিখিয়েছো তা থেকে তুমি নিজেই আমাকে আর ফিরিয়ে নিওনা। পুণ্য প্রেমে আমাকে আঁধার পথে আলো দেখিয়ে নিয়ে চলো যেন সেই আলোয় তোমার প্রেমের অর্ঘ্য সাজিয়ে রাখতে পারি। সেদিন আমরা বাঁচবো—সেইরকম ভাবেই বাঁচবো যে বাঁচার মধ্যে থাকবে কেবল অনন্ত যুগের বন্ধন।”

এতক্ষণ যে সঙ্গীদের কথা ভুলে গিয়ে নিজেদের চিন্তায় ডুবে ছিল সেদিকে তুজনের কারো খেয়াল ছিল না। বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দের মাঝে তুজনে কখন দাঁড়িয়েছিল পাশাপাশি। সঙ্গীরা ইতিমধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। আবার তাদের চলতে হ'বে সঙ্গীদের সাথে সমান তালে।

বিস্তৃত রিক্ত মাঠের বুকে এই কয়েকটি মুহূর্ত্ত স্মরণীয় হয়ে রইল একটা উদগ্র সুখস্বপ্নের মত।

স্বপ্নার ডাকে মুখ ফেরাতেই কান্তা দেবী স্বপ্নাকে দেখে হেসে ওঠেন। "কিরে স্বপ্না, আজ এমন অবেলায় এলি যে?" কান্তা দেবীর প্রশ্নে স্বপ্না খানিকটা অসুবিধায় পড়ে যায়। এদিক ওদিক মুখ ফেরাতে ফেরাতে স্বপ্না কান্তা দেবীর সাথে উঠান ছেড়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে। কান্তা দেবী এবারে স্বপ্নাকে কাছে টেনে নিয়ে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করেন "কিরে পাগ্‌লী, আমাকে দরকার? না আরও অন্য কোন কাজ আছে?" স্বপ্না এ প্রশ্নে সত্য সত্য লজ্জায় পড়ে যায়। জড়ান কথায় আঁচলটা আঙ্গুলের মধ্যে পাকাতে পাকাতে বলে ওঠে "মলয়দা কোথায় জ্যাঠাইমা?" কান্তা দেবী মুখ চেপে হেসে ঘাড় নেড়ে বলতে থাকেন "মলয় তো এখন বাড়ী নাই, কোথায় গেছে কে জানে?"

অলক্ষ্যে কথা শেষ কোরে কান্তা দেবী কখন বিছানা পরিষ্কার করতে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোরে যান, স্বপ্না'র খেয়ালই হয় না। মুখ তুলতেই কান্তা দেবীকে সামনে না দেখে স্বপ্না আরও লজ্জিত হোয়ে যায়। এদিকে আবার মলয়ের অনুপস্থিতি—কোনটাই যেন ভাল লাগে না।

চলে যাবে না দাঁড়িয়ে থাকবে? অনেক ইতস্তত কোরে স্বপ্না

জ্যাঠাইমার উদ্দেশ্যেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করে। স্বপ্না কান্তা দেবীকে ঝাড়ন হাতে দেখে তাড়াতাড়ি ঝাড়নটা কেড়ে নিয়ে নিজেই বিছানা পরিষ্কারের কাজে লেগে যায়। কান্তা দেবী বিশেষ বাধা না দিয়ে হেসে বলে ওঠেন "ও মা, এখন অত কাজ কোরে কি হ'বে? কাজের সময় অনেক পাবে, তোমাকেই তো তখন সব করতে হ'বে।" আর অপেক্ষা না কোরে কথা কইতে কইতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। স্বপ্না খানেকের জন্য থেমে একটু বেশী হাত পা নেড়ে আবার বিছানা পরিষ্কারের কাজে লেগে যায়।

ঘরের আসবাবপত্র যে রকম আলুথালু অবস্থায় পড়ে রয়েছে দেখলে মায়া হয়—বিশেষ কোরে স্বপ্নার। টেবিল, আলমারা সবই যেন ছন্নছাড়া অবস্থায় এদিকে ওদিকে পড়ে রয়েছে। ঘরের মালিকের অর্থাৎ মলয়ের অগোছালো ভাবকে ধিক্কার দিয়ে আপন মনে গুণ গুণ করতে করতে যতটা সম্ভব গুছিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। টেবিলের উপর উল্টে পড়ে থাকা মলয়ের ছবিটা তুলে নিয়ে পরিষ্কার করতে থাকে,—যতবার পরিষ্কার করে ততই যেন ময়লা জমে আসে! সত্যই কি এত ময়লা জমা হয়, না— স্বচ্ছ কাঁচের মধ্যে ঢাকা ছবিটা মাঝে মাঝে ঝাপসা হোয়ে যায়?

পায়ের শব্দে তাড়াতাড়ি মুখ ফেরাতে গিয়ে আচম্কা হাতের ছবিটা খসে পড়ে।

"এ কি? ছবির কাচ ভেঙ্গে গেল?" মলয় ব্যস্ত ভাবে এগিয়ে আসে। স্বপ্নাও অস্বাভাবিক মনোবেদনা থেকে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে "তাই তো—ছবিটা সত্যই ভেঙ্গে গেল—কি হ'বে মলয়দা?" মলয় এবার তামাসা কোরেই বলে ওঠে "গেছে কাচটা। বেশ ভালই হোয়েছে, ও ছবি নিয়ে টানাটানি কোরে লাভ কি? আসল মানুষ যখন আমোল পায় না তখন একটা ছবি গেলেই আর ক্ষতি কি?" স্বপ্না মলয়ের অনুযোগ সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে দুঃখ কোরে ওঠে "আসলই হোক আর নকলই হোক, জিনিষটা তো নষ্ট হোলো?" মলয় এবার ততোধিক জোরে বলে ওঠে "নষ্ট হোলো বেশ হোলো, ওছবি না থাকাই ভালো—ওর ভেতরে তো আসল মানুষ ঢুকে থাকে না যে কেউ কষ্ট পাবে?"

স্বপ্নাও এবার অনুশোচনা বন্ধ রেখে কোমড়ের কাপড়টা বেশ ভাল কোরে জড়িয়ে নিয়ে বলে চলে "যাঁর গেছে তাঁর গেছে—আমার কি? গেলে আপনারই ক্ষতি—তবে ভাল জিনিষটা এই যা—" মলয় কথা শোনা অপেক্ষা ভাঙ্গা কাঁচের মধ্যে থেকে স্বপ্নার ছবিটা উদ্ধার করার চেষ্টাকে নিরীক্ষণ করতে থাকে, আর মনে মনে স্বপ্নার প্রেমের গভীরতাকে অনুভব কোরে চলে।

স্বপ্না মলয়ের কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে নিজের হাতে ধরে রাখা ছবিখানা লক্ষ্য কোরে নিজেকে সাম্‌লাবার চেষ্টায় তাড়াতাড়ি সেখানা রাখতে রাখতে বলে ওঠে "যান্, আপনি কেবল আমাকে নিয়ে তামাসা করেন, আমি আর আসবো না।"

"একি অনুরাগ না পূর্ব্বরাগ স্বপ্না ?" মলয় বলতে বলতে দরজা আড়াল কোরে দাঁড়ায়।

"যে রাগই হোক্—সেটা ওই ছবির সঙ্গে, বুঝলেন ?"

মলয় হেসে বলে "ছবি তো আর আমি নই, এ কথাও বলে না—আর কাছেও টানে না, তবে ?" "কথা বলুক আর না বলুক এরকম দুষ্টামি করে না। যান্, এখন রাস্তা ছেড়ে দাঁড়ান তো—আমি বেরিয়ে যাই, আপনার কি কোন লজ্জা নাই ? জ্যাঠাইমা এখনি এদিকে এলে কি হ'বে বলুন তো ?"

স্বপ্নার কথা কেড়ে নিয়ে মলয় দরজা ছেড়ে দিয়ে বিছানার উপর বসে বলে চলে "যা হবার তা তো হ'বেই, আমি না হয় দুষ্টুই হ'লাম, কিন্তু তুমি ? তুমি যে দিনে ডাকাতি করছিলে স্বপ্না ?" স্বপ্না উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই জ্যাঠাইমার ডাক আসে—"কই স্বপ্না, কোথায় গেলি মা !" স্বপ্নাও "এই যাই জ্যাঠাইমা !" বোলে মলয়ের দিকে একটু মুচকি হেসে 'কেমন হোলো তো ?' বোলে একখানা মোড়া কাগজ ব্লাউসের ভেতর থেকে বের কোরে টেবিলের উপর রেখে তাড়াতাড়ি সরে পড়ে।

৫

মলয় কাগজখানা লক্ষ্য কোরে বিছানা হোতে উঠে পড়ে। কাগজখানা খুলতেই তারই হাতের লেখা কবিতা দেখতে পায়। ছাপার অক্ষরে লিখা এই কবিতা, কোন মাসিক পত্রিকা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া। কয়েকটী লাইন মলয় আপন মনেই পড়ে যায়—

ভুল হোয়ে থাকে, সে ভুল আমাকে,
কেন বল তুমি করালে ?
মিলনের সাথী, কেন বল দেখি
চির দুঃখে আমায় ভরালে ?

আজ সকালেই একখানি বিরাট রঙচঙে মোটর গাড়ী স্বপ্নাদের বাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়। গাড়ীর আরোহিনী শোভারাণী স্বপ্নাদের বাড়ীর ভেতরে বেশ ব্যস্ত ভাবে ঢুকে পোড়ে মাধবীদেবীর সাথে গোপনে কি ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছেন। স্বপ্না আদৌ কিন্তু খুসা হতে পারে নি। মাধবীদেবীকে দেখলে মনে হয় যে, তিনি এতক্ষণের কথাবার্ত্তায় বেশ খুসী হয়েই উঠেছেন। মেয়েকে ডেকে সাজগোজ করার জন্যে তাগিদ দিয়ে ওঠেন "স্বপ্না, নাও একটু তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও, এদের যে বড্ড দেরী হ'য়ে যাবে।" সাথে সাথে শোভারাণীও যোগ দিয়ে বলে ওঠেন "কই মা স্বপ্না, নাও শীগগির নাও, বড়লোকের মেজাজ কিছু কি বলা যায় ? আবার

দেরী হোয়ে গেলে কৈফিয়ত দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়ে উঠবে।" স্বপ্না প্রথমে ঠিক করেছিল যে কিছুতেই শোভারাণীর সঙ্গে সে যাবে না। কিন্তু শেষে মায়ের আগ্রহ দেখে চোখের জল ফেলেও তাকে গাড়ীতে উঠতে হলো।

পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত শোভারাণী একটী ভাল পাত্র সন্ধান করে চলে এসেছেন। পাত্র ধনী—নাম মধুকর দাস। বয়স মাঝামাঝি। প্রাণে সখও প্রচুর, তাই শোভারাণীর কথামত স্বপ্নাকে দেখবার জন্য গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন।

যথাসময়ে শোভারাণী স্বপ্নাকে সঙ্গে করে বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করেন। বাড়ীটা সহরের একপ্রান্তে নির্জ্জন আবহাওয়ার মধ্যে একটী বিস্তৃত জায়গায় বেশ মনোরম ভাবেই বিরাজ করছে। সামনে বিরাট উদ্যান। উদ্যানে দৃষ্টি-আকর্ষণ-কারী অনেক কিছুই চোখে পড়ে, সবচেয়ে বেশী করে চোখে পড়ে পাথরের নগ্ন মূর্ত্তিগুলি। কত সূক্ষ্ম কল্পনার মধ্যে যে এগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল তা তখনকার সৃষ্টিকর্ত্তাই জানেন। তবে তিনি নিছক্ খেয়াল মেটানোর জন্যেও এরূপভাবে উদ্যানকে সাজিয়ে ছিলেন কিনা বলা মুস্কিল। তারপরেই চোখে পড়ে আশে পাশে ছোট বড় ফুলের গাছগুলো। পচা পাতা আর অযত্ন-সুলভ আগাছায় সমস্ত বাগানটা ভরে রয়েছে। দেখে মনে হয় বাড়ীর মালিকের সাথে উদ্যানের ইদানীং কোনরূপ

সম্পর্ক মোটেই নাই। এমন কি ঝরে পড়া পাতাগুলো যে পথচারীদের বেশ ব্যাঘাত ঘটায়, তবুও যেন কারো ভ্রূক্ষেপ নাই।

বড় গেট পেরিয়ে সিঁড়ির কাছাকাছি এসে দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর আস্তে আস্তে চাকরের নির্দ্দেশ মত বড় হলঘরের ভেতর দিয়ে একটি বিশেষ কামরায় প্রবেশ করে। এতক্ষণ স্বপ্না যেন যন্ত্রচালিত পুতুলের মতন অর্দ্ধচেতন অবস্থায় শোভারাণীর অনুগমন করছিল। ঘরের ভেতর প্রবেশ করে নিজের সম্বন্ধে ভাববার সুযোগ পেল। শোভারাণীকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বলে উঠলো "কি পিসিমা, আপনি আমায় কোথায় নিয়ে এলেন? এ যে যমপুরী বলে মনে হয়, এখানে কোন মানুষ থাকে না কি? আর থাকলেও সে তো সরলভাবে থাকে বলে মনে হয় না।" স্বপ্নার কথাবার্ত্তায় শোভারাণীও একটু চঞ্চল হয়ে পড়েন, সান্ত্বনার সুরে বলে ওঠেন "না স্বপ্না, আমি যখন আছি কোন ভয় নাই, এখানে খুব ভাল লোকই থাকে, এখনি সব দেখতে পাবে।" শোভারাণী তাড়াতাড়ি একটি চেয়ারে স্বপ্নাকে বসতে বলে ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক তাকাতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বেশ জোরে জোরে পা ফেলতে ফেলতে এক বলিষ্ঠ ভদ্রলোক ঘরের ভিতর প্রবেশ করেন।

স্বপ্নাকে দেখে বেশ হাসিমুখেই বলে ওঠেন "বাঃ বেশ খাসা মেয়ে তো; এতদিন তুমি কোথায় ছিলে বাবা!" কথা বলার সাথে সাথে মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরিয়ে আসে।

শোভারাণী স্বপ্নার ভাবভঙ্গী দেখে তাড়াতাড়ি ভদ্রলোকটীকে ইঙ্গিত করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন। স্বপ্না এতক্ষণ ভয়ে আড়ষ্ট ভাবে বসেছিল, আর মনে মনে দুদিনের আত্মীয়ার ওপর বিশ্বাসের অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছিল। হঠাৎ বিপদে কি করবে কিছু ঠিক করে উঠতে পারছে না স্বপ্না। পালাবার চেষ্টা করাও বৃথা। সব জেনে শুনেই বেশ শক্ত ভাবে নিজেকে বিপদের সম্মুখীন হবার প্রয়াস পাচ্ছিল। কিন্তু হায়, শক্তি তার কতটুকু যে সে অনায়াসেই এই বন্ধ ঘর থেকে মুক্তি পাবে?

এবার শোভারাণী জোর করে মুখে হাসি টেনে ঘরের ভেতর প্রবেশ করেন। স্বপ্নাকে মধুর বাক্যে বলে ওঠেন "স্বপ্না, পাত্র দেখলে তো? এবার পছন্দ হয় কি না বলে ফেল তাহলে? বিয়েটা শীঘ্রই দেওয়া হোয়ে যায়।" এমনভাবে কথাগুলো বলে গেলেন যেন বিয়ে হওয়াটা তার পছন্দ হওয়ার ওপর বিশেষ নির্ভর করে না। স্বপ্না কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কথাগুলো গলাধঃকরণ করে চলেছে, কি ভাবে প্রতিবাদ করবে ভেবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। মনে মনে ভাবে—একবার দৌড়ে গিয়ে শোভারাণীর গলা টিপে ধরে—কিন্তু ফল কি? বিশেষ

কোন উত্তর না পেয়ে শোভারাণীও হাসতে হাসতে বেরিয়ে যান। যাবার সময় একটা চাকরকে কি ইঙ্গিত করে চলে যান।

কতক্ষণ যে এভাবে একলা একলা চলে গেছে তা স্বপ্নার মনে পড়ে না। টেবিলে মাথা রেখে স্বপ্না তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো। হঠাৎ মুখ তুলে চেয়ে দেখে একটি মহিলা, দেখলে মনে হয় পরিচারিকা—তাকে কি ইঙ্গিত করছে। "নাও বাছা উঠে পড়—স্নান খাওয়া সেরে নাও, নইলে বাবু রাগ করবেন।" কথাগুলো একটু বেশ ঝাঁঝালো ভাবেই পরিচারিকাটী বলে ফেলে।

স্বপ্না জিজ্ঞাসা করে ওঠে "কখন বাড়ী যাব?" পরিচারিকাটি ওকথায় কান না দিয়ে হাত ধরে স্বপ্নাকে তুলে এক রকম টেনে নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। স্বপ্না প্রথমটা একটু বাধা দেবার চেষ্টা করলেও বিশেষ কিছু ফল হয় না। এ বাড়ীর সবই যেন কেমন অদ্ভুত। চতুর্দ্দিকে নিস্তব্ধতার মধ্যেই সব কাজ হয়ে চলেছে। হাসি কান্নার বালাই এখানে দেখা যায় না। পরিচারিকাটী তার কাজ শেষ করে একটী সাজানো গোছান ঘরে স্বপ্নাকে বসিয়ে চলে যায়। ঘরে আসবাবপত্র প্রচুর। খাট বিছানা থেকে আরম্ভ করে ড্রেসিং টেবিল পর্য্যন্ত বেশ পরিপাটী করে সাজানো। দেখলে মনে হয় বহুদিন পূর্ব্বে এই ঘরটির সদ্ব্যবহার হয়ে গেছে, ইদানীং ব্যবহার হয়েছে বলে মনে হয় না।

কষ্টোপার্জ্জিত না হলে বা আদর্শ ও কর্ত্তব্যবোধ না থাকলে মানুষ যেভাবে সুখের জীবনে বিলাসের উপকরণ ক্রমাগত বাড়িয়ে চলে—মধুকরবাবুরও আজ সেই অবস্থা। পূর্ব্বপুরুষের কাছ হোতে পাওয়া কটন মিলের ব্যবসা ও প্রচুর অর্থ তাঁকে বাধাহীন স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলে পাপের পথে। মিল-মালিক হোলেও ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর খুবই কম। দেনাপাওনার ও কাজের হিসাবনিকাশের জন্য লোকজন ও কারিগর রেখেই তিনি খালাস। অর্থের প্রয়োজনই তাঁর কাছে বড়। কোনদিন তিনি মিল সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে চিন্তিত হোয়েছেন বলে মনে হয় না। কাজের তদারক করা তো দূরের কথা—কখনও কখনও মিলের ম্যানেজার খাতার ও কাগজের জের টেনে নিয়ে সই করিয়ে নিয়ে যান। মদের নেশার মধ্যে কখনও সখনও মিল বন্ধ থাক্‌লে কারিগরের উপর ঘরে বসেই হুম্‌কি ছাড়েন—কর্ম্মস্থল পরিদর্শন করার সময়ই মধুকর বাবুর হয়ে ওঠে না—ব্যাঙ্কের জমা টাকা যখনই ফুলে ওঠে তখনই মদের বোতল ঘন ঘন খালি হোতে থাকে। পাপপুণ্য সমান কোরে বয়ে বেড়াবার সাহস আর কারও আছে কিনা জানা নাই, তবে মধুকর দাস ওরফে উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যথেষ্টই যে আছে সে প্রমাণ তিনি জীবনে অনেকবার দিয়ে এসেছেন। আজও তাঁকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে এক অন্ধকারময়

ঘৃণিত জীবনের নেশা। বাধা দেবার মতন কোন নিকট আত্মীয় নেই, আর যাঁরা আছেন তাঁরা কেবল সামান্য সুবিধার লোভে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছেন আর বাহবা দিচ্ছেন।

কান্নাকে এতক্ষণ স্বপ্না চেপেই রেখেছিল, কিন্তু আর বেশীক্ষণ চেপে রাখা সম্ভব হোলো না। আপনা হতেই চোখের জল গড়িয়ে পড়তে চায়।

হঠাৎ মুখ তুলে চেয়ে দেখে সেই ভদ্রলোটী একটু গম্ভীর ভাবেই আস্তে আস্তে ঘরের ভেতর প্রবেশ করলেন। স্বপ্নার প্রথমটা যেন একটু আতঙ্ক হল, কিন্তু শেষে মনে জোর এনে টেবিলের একধারে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভদ্রলোক কোন কিছু বলার আগেই স্বপ্না বলে ওঠে "এভাবে আমাকে আটকে রেখেছেন কেন? আমাকে ছেড়ে দিন।" ভদ্রলোক মুখে একটু হাসি টেনে বলে ওঠেন "এ আটকানো নয় প্রিয়তমা, এ প্রেমের বন্ধন।"

স্বপ্না কথাগুলো শুনে মনে মনে ভাবে লোকটা কি নির্লজ্জ! কোন কথাই মুখে আটকায় না?

"আপনি কি আমাকে জোর করে বিয়ে করতে চান?"

এবার ভদ্রলোক বেশ গদগদ ভাবে বলে ওঠেন "আমার অনেক দিনের আশা, আমার অনেক দিনের স্বপ্ন যে আমি তোমার মতন একটী মেয়েকে বিয়ে করে পাপের পথ হোতে

নিজেকে উদ্ধার করি। আমার এ বিষাক্ত, ঘৃণিত জীবন আর বয়ে বেড়াতে পারছিনা। স্বপ্না, আমাকে উদ্ধার করো, আমাকে বাঁচাও!"

স্বপ্না এবার বেশ জোর করেই বলে ওঠে "আমি গরীব অসহায় বলে আপনি আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করবার সাহস পাচ্ছেন। গরীবদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার পিপাসা কি আজ ও আপনাদের মিটলো না?"

স্বপ্নার চোখেমুখে একটা তেজোদৃপ্ত উদ্দীপনা। মুহূর্ত্তমাত্র চুপ করে আবার বলে চললো—"আপনারা জোর কোরে আর কতকাল এভাবে আমাদের নিয়ে খেলার পুতুল করে বেড়াবেন? আমাদের মান মর্য্যাদা আর কতদিন আপনাদের পায়ে বিক্রি হ'তে থাক্‌বে, বলুন তো?"

কথার মধ্যে যে প্রাণের আবেগ ছিল তা বুঝতে মধুকরবাবুর বেশী দেরী হয় না। জীবনে অনেকদিন অনেক মেয়ের সামনা সামনি এসেছেন কিন্তু স্বপ্নার মতন এরকম দৃঢ়-চিত্ত মেয়ের কাছে এর আগে এসেছেন বলে মনে পড়ে না। কথাবার্ত্তা ও চালচলনে মনে হয়, একে জোর করে বাঁধবার চেষ্টা করলেও প্রাণের সাড়া মিল্‌বে না; আর সে বাঁধনে যে কোন বিপদ আসতে পারে না তাই বা কে বলতে পারে?

কথায় কোন ফল হবে না জেনে ভদ্রলোক আস্তে আস্তে

স্বপ্নার দিকে এগিয়ে আসেন, হাতের আঙ্‌টীটা খুলতে খুলতে বলে চলেন—"তোমাকে আমার সব কথা এখনও বলা হয়নি স্বপ্না, আমি তোমায় জোর করে আর ধরে রাখতে চাই না; আমার সমস্ত কথা শুনে যদি তোমার দয়া হয়, তা হলে আমার সাথে এসো। নইলে আর তোমায় আমি জোর করে আমার ভাগ্যের সাথে জড়িয়ে নিতে চাই না।"

কথাগুলো আস্তে আস্তে বলে বিছানায় বেশ ভালভাবে বসে নিয়ে আবার সুরু করেন "দেখ স্বপ্না, ধন সম্পত্তি বলতে যা বোঝায় তা আমার প্রচুর আছে। আমার নাম মধুকর, মধু আহরণ করবার জন্যে আমার অনেক বন্ধু বান্ধবই আমার কাছে আসা যাওয়া করে, আমিও আমার পিতৃপুরুষের স্বভাবমত যতটা পাই বেশ মনের সাধে ভোগ করে চলেছি। বাধা দেবার মতন কেউ নাই। আমার থাকার মধ্যে আছে এক বিধবা বোন্। তাকে নিয়ে আমি বুকে অনেক আশা বেঁধেছিলাম; তখন আমার এ নেশা ছিল না। আমার স্নেহের ছোট বোন। অনেক আশা নিয়েই ভাল ঘর দেখে বিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু ভগবান সে দর্প আমার ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন।"

কথাগুলো বলার সাথে সাথে গলার স্বরও একটু ভারী

হয়ে ওঠে, নিজেকে সামলে নিযে আবার বলতে থাকেন—"অতি অল্প কয়েক দিনেই আমার বোন বিধবা হোযে আমার কাছে ফিরে এলো, আমার সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠলো।" এখানে ভদ্রলোক একটু থেমে আবার বলতে সুরু করেন "কিছুদিন পরে আমি মনে ঠিক করলাম যে 'মায়ার' আবার বিয়ে দেবো। পাত্রও এক রকম ঠিক করে এসেছিলাম, কিন্তু ভাগ্য, সব ভাগ্য স্বপ্না—"

এবার ব্যাকুলভাবে স্বপ্না ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে থাকে।

"বিয়ের কথা শুনে মাযার মাথা গেল খারাপ হয়ে—অনেক চেষ্টা করলাম, কোন ফল হোলো না, আজ মায়া দিনের পর দিন ওপরের ঘরে চুপটী করে বসে থাকে—কারো সাথে কথা পর্য্যন্ত বলে না—অভিশপ্ত জীবন কেবল মুক্তি চায়।"

কথার শেষে ভদ্রলোকেব চোখ দিয়ে ৯ ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে—তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে নিয়ে স্বপ্নাকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠেন "স্বপ্না, আমার একটা অনুরোধ, আমার এই আঙটীটা যদি তুমি নাও; এ দেওয়ার সাথে বিয়ের কোন সম্পর্ক নাই, এ শুধু আমার মনের সান্ত্বনা, যত অন্যায়ই কবি না কেন মরবার আগে এটুকু সান্ত্বনা পাবো যে তোমার মতন একজন সাধ্বা মেয়ের সঙ্গে আঙটী বদলের সুযোগ পেয়েছিলাম।

তুমি আমায় স্বীকার না করলেও, আমার স্বপ্ন কোন দিনই আমার কাছ হোতে সরে যাবে না।"

স্বপ্না বিশেষ কোন কথা না বলে আঙটীটা আঙুলে পরে নিল। হঠাৎ একটা উৎকট শব্দে দুজনেই চমকে ওঠে। আলুথালু বেশে এক যুবতী মহিলা হিঃ হিঃ কোরে হাসতে হাসতে দরজার কাছে এসে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে। একে দেখে স্বপ্নার চিনে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না যে এই সেই পাগল হয়ে যাওয়া 'মায়া'।

মায়া দরজার কাছে এসে স্বপ্নাকে দেখে ঘাড় বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে নিরীক্ষণ করতে থাকে। মধুকরবাবু অসময়ে তার উপস্থিতিতে বেশ ভয় পেয়ে যান; তাড়াতাড়ি উঠে চাকরদের ডাক্‌তে ডাক্‌তে বেরিয়ে যান। স্বপ্নাও পাগলের হাবভাব দেখে ভয়ে শিউরে ওঠে, গা তার ছম্‌ছম্‌ করে। জিব শুকিয়ে ভেতরের দিকে টানতে থাকে—কি করবে কিছুই স্থির করে উঠতে পারে না।

এবার মায়া আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে ও চোখ পাকাতে পাকাতে বলতে থাকে—"তুমি এ-খা-নে কেন?" স্বপ্নাও উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে বলে "আমি যে আপনাদের অতিথি।" "অতিথি ব-ল-লেই তো চলবে না, তোমার উদ্দেশ্য নি-শ্চয়ই খারাপ।" কথাগুলো বলে পাগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে মাটীতে পড়ে যাওয়া

আঁচলটা টানতে টানতে এগিয়ে আসে। আবার বলে ওঠে "তোমায় য-দি গলা টি-পে ধরি এবার— হিঃ হিঃ হিঃ।"

স্বপ্না রীতিমত ভয় খেয়ে যায়—কি বলবে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারে না। যাই হোক্ টেবিলের কাছে এসে পাগল ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ে। পরক্ষণেই আবার এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করতে করতে খুব আস্তে আস্তে আঙ্গুল দেখিয়ে দেখিয়ে বলে ওঠে "তুমি কি আমার বৌদি হ'তে চাও না কি?"

স্বপ্না নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত—তাই খুব ছোট্ট একটা "হুঁ" দিয়ে আকুল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। পাগলও যেন কিছুক্ষণের মধ্যে অন্যরকম কথা বলা সুরু করে "তুমি আ-মা-য় ভাল-বা-সবে বৌদি, অ-নে-ক করে খাওয়াবে তো?" স্বপ্নাও "হ্যাঁ" বলে ওঠে। হঠাৎ স্বপ্নার মাথার দিকে চেয়ে মায়া যেন লাফিয়ে ওঠে "এ কি বৌদি, তোমার মাথার সিঁদুর কি হোলো? মাথার সিঁদুর ভাল করে দিতে হয় যে, আমার ঘরের বৌদি তুমি, নইলে দাদার যে অমঙ্গল হবে। দাঁড়াও আমি নিয়ে আসি।" বলা শেষ কোরে মায়া ব্যস্তভাবে ঘর থেকে নিমিষে ছুটে বেরিয়ে যায়।

স্বপ্না যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে।

এতক্ষণে মধুকরবাবু এসে হাজির হন। স্বপ্নাকে অসহায়

অবস্থায় দেখে বিব্রতভাবে বলে ওঠেন "স্বপ্না দেবী, আপনাকে আমি যথেষ্টই কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না। ছন্নছাড়া জীবনের যে কি পরিণতি তা তো দেখতেই পেলেন, আর আপনাকে আমি দেরী করাবো না, আসুন আপনাকে আমি সসম্মানে আপনার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিই।"

কথাগুলো বলে শোভার উদ্দেশ্যে চেঁচামেচি করেন। শোভারাণীও ঠিক সময়ে চোখ মুছতে মুছতে এসে হাজির। সে এক করুণ দৃশ্যের মধ্যে মধুকর বাবু স্বপ্নাকে পাঠাবার ব্যবস্থা শেষ করেন।

এদিকে যত বেলা পড়তে থাকে মাধবী দেবী ততই চঞ্চল হয়ে ওঠেন। দুদিনের আলাপ এই শোভারাণীর সঙ্গে। বিশেষ বয়সের মেয়েকে একা একা পাঠিয়ে দিয়েছেন। নিঃস্বহায় জীবনে আইবুড়ো মেয়ে পার করতে তিনি এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন—তাই পাঠাবার আগে অত তলিয়ে ভাববার সুযোগ পান নি। এখন ফিরতে বিলম্ব দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে যান। নিজেকে বারবার ধিক্কার দিতে থাকেন। একথা বাইরে প্রকাশ করতে সাহস পান না, কিন্তু শেষে বেলা পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মলয়কে খবরটা জানাবার চিন্তায় অধীর হোয়ে ওঠেন।

একখানি গাড়ীর শব্দ ভেসে আসে; শোভারাণী আর স্বপ্না

এসে পৌঁছে যায়। গাড়ী থেকে স্বপ্নাকে নামতে দেখে মাধবী দেবী অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। মায়ের চিন্তিত মুখ দেখে স্বপ্নার ঠোঁটেও হাসি খেলে যায়। শোভারাণীরও প্রাণে ভয় কম ছিল না—কিন্তু স্বপ্নাকে হাসতে দেখে ভয়ে ভয়ে মাধবী দেবীর কাছ থেকেই দু চারটা কথা বলে আজকের মতন বিদায় নেন। গাড়ীতে উঠতে উঠতে এক একবার আড়চোখে স্বপ্নাকে দেখতে থাকেন, ভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হোয়েছে কিনা লক্ষ্য করে যান।

সেদিন খাওয়া দাওয়া শেষ করে স্বপ্না দুটী অদ্ভুত ভেসে যাওয়া জীবনের কথা মাধবী দেবীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে থাকে। মাধবীদেবীও চোখের জল ফেলে সহানুভূতি দেখাবার চেষ্টা করেন। হঠাৎ মলয়ের প্রবেশে দুজনেই চমকে ওঠে। মাধবী দেবীও ব্যস্তভাবে মলয়কে আহ্বান জানান। মাধবীদেবীর ইচ্ছা ছিল যে তিনি মলয়কে ইতিবৃত্তান্ত সবই বলেন।

কিন্তু স্বপ্নার অনুরোধে আর বলা হয় না।

মলয় আজ এসেছে স্বপ্নাকে আমন্ত্রণ জানাতে। আগামী দিনেই তাদের স্কুলের সাময়িক ভাবে উদ্‌বোধন হবে। সেই সূত্রে স্বপ্নার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়। স্বপ্না প্রথমটা বেশ হাসিমুখেই নেমন্তন্ন ফিরিয়ে দেবে এইটাই ঠিক করেছিল।

কিন্তু মলয়ের অনুরোধ তাকে এমনি পাগল কোরে তোলে যে সে রাজী না হোয়ে পারে না।

মলয় বেশ ভাবাবেগে অন্যান্য অতিথিদের উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে। চলে যাওয়ার পূর্ব্বে সাইকেলের বেলটা জানালার সামনে একবার বেজে ওঠে, জানালা দিয়ে উঁকি মারতেই এক মধুর দৃষ্টি বিনিময় ঘটে যায়; দু'জনার মধ্যে কেউই ভাবতে পারে না বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা। আর বাধার মতন এমন তো কোন জিনিষ গজিয়ে ওঠে নি যা নিয়ে দুজনেই ভয় খেয়ে যাবে?

মলয় ফ্যাসাদে পড়ে অরুণকে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়ে। অরুণের এখন নববিবাহিতা স্ত্রী। বাইরে বেরুবার বিশেষ সুযোগ পায় না। কাজ থাকলেও অনেক জায়গায় বেরুতে হয় সত্যি, কিন্তু এখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সংসারের কাজ নিয়েই তাকে ঘরের মধ্যে বসে থাকতে হয়। অনেক দিন পরে মলয়ের আগমনে অরুণ বেশ ঘটা করেই সমাদর জানায়। মলয়ও প্রথমটা বসে বসে এদিক ওদিক খবর নিতে থাকে, আর মাঝে মাঝে অরুণের ভাব ভঙ্গী লক্ষ্য করে। কোন কিছু কাজ কর্ম্মে অরুণেরই বেশী উৎসাহ এতদিন মলয় দেখে এসেছে। কিন্তু এই কয়েক মাস সেই সব উৎসাহ আর যেন দেখা যায় না। মলয়ের আমন্ত্রণ বেশ খুসী মনেই অরুণ গ্রহণ করে, কিন্তু

কাজের চাপে অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা চেয়ে বসে। অরুণের নিঃসাড় দেহে আর কোন নতুন সাড়া খুঁজে না পেয়ে চায়ের কাপে তাড়াতাড়ি চুমুক দিয়ে মলয় বেরিয়ে পড়ে।

সেদিন বেশ আনন্দ ও হৈ চৈ এর মধ্যেই উদ্বোধন অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হোয়ে যায়। অনেকেই মলয়ের এই প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। কেউ কেউ আদর্শবাদী মলয়ের উপর গভীর শ্রদ্ধা জানাতে কসুর করলেন না। সবচেয়ে মুস্কিল হোয়েছিল ওই সত্যেন আর রীতা দেবীকে নিয়ে। এদের বক্তৃতায় যে সত্য ও আদর্শের দর্শন ছিল তাকে অনেকে গ্রহণ করতে পারে নি। বিশেষ করে যারা একটু বিশেষভাবে পুষ্ট হয়ে হেল্‌তে দুল্‌তে সভাকে কৃতার্থ করতে এসেছিলেন। অনেকে বিরক্তও হোয়েছিলেন। কিন্তু এঁরা একজনের কাছে সবচেয়ে বেশী প্রশংসা পেয়েছিলেন। মনে মনে মলয় এদের গভীর শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারে নি—এদের কর্ম্মধারা মলয় বিশেষভাবে উপলব্ধি না করলেও এদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার উপর মলয়ের অগাধ বিশ্বাস ছিল, তাই বক্তৃতার মাঝে ওদের প্রসঙ্গে কিছুটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়ে যায়।

ভোর হোতে না হোতেই মধুকর বাবু আর মায়া এসে হাজির। স্বপ্না তখন অমলের পড়া দেখিয়ে দিতে ব্যস্ত। অমলের

প্রথম থেকেই যেন পড়ার উৎসাহ কম। বসে বসে কেবল পেন্সিল দিয়ে মাদুর খুটছে। মধুকর বাবু মায়ার হাত ধরে বেশ ত্রস্ত ভাবেই স্বপ্নার খোঁজে বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করেন। মাধবী দেবী নতুন মানুষ দেখে মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে সরে দাঁড়ান।

স্বপ্না ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দুজনকে দেখেই বেশ চমকে ওঠে। মধুকর বাবু স্বপ্নার হাবভাব দেখে নিজেকে সাম্‌লে নেন। "আর বলো না স্বপ্না, কাল রাত্তির থেকে মায়া আমাকে পাগোল করে ফেলেছে; ডাক্তার বাবু এসে সমস্ত শুনে তোমার এখানে বেরিয়ে নিয়ে যাবার উপদেশ দিয়ে গেলেন। তাই—" স্বপ্না বাধা দিয়ে মায়াকে সম্বর্ধনা করে বসতে দেয়। মায়া এতক্ষণ চুপ করেই অবজ্ঞার ভাব নিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। আজকের সাজ সজ্জায় মায়ার বেশ গোছানো ভাব ধরা পড়ে। হঠাৎ স্বপ্নাকে দেখে মায়া আনন্দে উৎফুল্ল হোয়ে লাফিয়ে ওঠে। "তুমি বৌদি এ—খানে দাঁড়িয়ে আছ?" মধুকর বাবু বাধা দিয়ে বলে ওঠেন "এটা স্বপ্নাদের বাড়ী মায়া, এখানে একটু ভালভাবে কথাবার্ত্তা কইতে হয়। স্বপ্না তোমাকে কত ভালবাসে। কই, স্বপ্নাকে নমস্কার জানালে না?" মায়া তাড়াতাড়ি নমস্কার কোরে স্বপ্নার কাছে এগিয়ে যায়।

এতক্ষণ বসবার কোন জায়গা দেওয়া ছিল না, এবার

মাধবী দেবী এক হাত ঘোমটা দিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে মাহুরখানা বের করে দেন। মধুকরবাবুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্বপ্না জানিয়ে দেয় ইনি তার "মা"। মধুকরবাবু তাড়াতাড়ি ধূলো নিতে এগিয়ে যান—যেন এর মধ্যে কত ভুলই না হয়ে গেছে। মাধবী দেবী এবার ঘোমটা একটু কমিয়ে দিয়ে "থাক্ থাক্" বলে ওঠেন।

প্রথম দিন মায়াকে দেখে স্বপ্নার প্রাণে যতটা ভয় দেখা দিয়েছিল আজ আর সে ভাব নাই। মায়ার চালচলনে যে বেশ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে মায়াকে না দেখলে তা অনুমান করা যায় না। স্বপ্নাকে কাছে বসিয়ে ধীরে ধীরে মায়া কথা বলতে থাকে "তোমার নাম স্বপ্না—নয় বৌদি?" স্বপ্না ছোট্ট করে উত্তর দেয় "হ্যাঁ—আচ্ছা, আপনার বড কষ্ট হয় না মায়াদি?" "কই না তো, কষ্ট কিসের, দাদা রয়েছেন, তুমি—বৌদি রয়েছো আমার আবাব কষ্ট কিসের? এখানে কিন্তু আর আপনার থাকা হচ্ছে না, আমার সঙ্গে আমার কাজের সাথী হয়ে থাক্তে হ'বে, নইলে—"কথার মাঝে মায়া আবার চেঁচিয়ে ওঠে "একি বৌদি, তোমার মাথায় সিঁদুর কি হোলো?"

মধুকরবাবু তাড়াতাড়ি সাম্নে এসে বলেন "ছিঃ মায়া, তুমি ভয়ানক গোলমাল করো। ওই জন্যেই তো তোমাকে কোথাও নিয়ে যাই না।" দাদাকে মায়া বেশ জোরেই ধমক

দিয়ে ওঠে "রাখো তুমি দাদা। মাথায় সিঁদুর না থাক্‌লে বুঝি মানায়? তুমি আমায় শিক্ষা দিচ্ছো—না আমায় পাগল ভেবেছ?"

স্বপ্না এ কথার কি উত্তর দেবে ভেবে কূল কিনারা পায় না। মায়ার ওপর তার বিশেষ স্নেহ জেগে উঠেছে—কেমনে সেই স্নেহে আঘাত করে? আহা! বেচারী মায়ার যে কি কষ্ট তা এরকম ভাগ্যহীনার জীবন চোখে না দেখলে উপলব্ধি করা যায় না।

মধুকরবাবু স্বপ্নার বিব্রত ভাব দেখে তাড়াতাড়ি মায়ার হাত ধরে টান্‌তে টান্‌তে বলে ওঠেন, "মায়া, চল—এখন বাড়ী চল। ওদিকে যে বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে—খাবার সময় হোয়ে এল।" মায়াও রেগে বলে ওঠে—"না, আমি এখন কিচ্ছু খাবো না। আমি এখানে বেড়াবো, গল্প করবো—আমার যা ইচ্ছা তাই করবো।" মধুকরবাবু এবার রীতিমত ধমক দিয়ে মায়ার হাত ধরে টানতে টানতে বাইবে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন।

স্বপ্না কি বলে যে সান্ত্বনা দেবে ভেবে ঠিক করতে পারে না—কেবল তুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। মনে মনে এই ভাই বোনের পরিণতির কথা আর একবার স্মরণ করে মনের মাঝে গভীর বেদনা অনুভব করে।

যাবার সময় স্বপ্নার দিকে চেয়ে মধুকরবাবু হাসতে হাসতে

বলে ওঠেন "সকাল বেলাই অনেক কষ্ট দিয়ে গেলাম স্বপ্না—কিছু মনে করো না।"

স্বপ্না কোন কথার উত্তর না দিয়ে, কেবল অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে দাঁড়িয়ে থাকে;—মিষ্টান্ন দিয়ে অতিথি সৎকারের প্রয়োজনের কথা একেবারেই মনে আসে না।

হঠাৎ দুপুর বেলা বস্তির মধ্যে এক গোলযোগের সূচনা দেখা দিল। অক্ষয় বাউলে হাতে একখানা চেলা কাঠ নিয়ে বসন্ত কোলের বাড়ীর দিকে গজরাতে গজরাতে এগিয়ে যায়। আজ এ কদিন ধরে স্বপ্নাকে নিয়ে ভালমন্দ আলোচনায় অনেকেই যোগদান করে; এর মধ্যে ওরা দুজনেও ছিল। বসন্ত কোলে নাকি স্বপ্নার চরিত্রে কটাক্ষপাত করেছে। অক্ষয় তাই বসন্তকে এক হাত দেখে নিতে চায়।

বস্তির মধ্যে অক্ষয় বাউলে হরিসাধনবাবু বা তার পরিবারের সকলকে একটু বেশী স্নেহের চক্ষে দেখতো। সময় থাকলে স্বপ্নাও তাদের প্রতিবেশী হিসাবে অক্ষয় বাউলের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে গল্প গুজোব করতো—সেলাই বোনার কাজও একটু একটু শিখিয়ে দিতো। সময়ে অসময়ে এরকম বস্তির অনেক মেয়ের সাথেই স্বপ্না দেখা সাক্ষাত করে ও ভাল-মন্দ কাজের বুদ্ধি যোগায়। স্বপ্নার সংযত ব্যবহার অনেকেরই বেশ ভাল লাগে।

কিন্তু বসন্ত কোলে স্বপ্নাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতো না। একটু খোঁজ করলে হয়তো এ বিরূপতার কারণ ধরা পড়ে যায়। তখন হরিসাধনবাবু বেঁচে ; বসন্ত কোলে কথায় কথায় তাঁর এক ছেলের সাথে স্বপ্নার বিয়ের প্রস্তাব তুলে-ছিলো, কিন্তু ফল বিশেষ সুবিধে হয় নাই। যদিও ছেলের বিয়ে অনেক আগেই সারা হয়ে গেছে, তা হ'লেও বসতির মধ্যে এমন একটি সৎপাত্রী যে হাতছাড়া হয়ে গেছে সেটা ওর সহ্য হয় নি। তাই একটা সুযোগ পাওয়া মাত্রই বিষোদ্গার করে বলেছিলো "অতটা কি বাড়াবাড়ি আমাদের ঘরের মেয়েদের পক্ষে ভাল; লাজ লজ্জা কি একেবারেই পুড়িয়ে খেয়েছে ?"

কথাটা কিন্তু আরও একটু অতিরঞ্জিত হোয়ে অক্ষয় বাউলের কানে গিয়ে প্রবেশ করে। এই মন্তব্যটা উপলক্ষ্য করেই অক্ষয় বাউলে এগিয়ে চলে। পথে যামিনী, কানাই— যার সাথেই দেখা হয়, বেশ চেঁচিয়ে বলে ওঠে—"শুনেছ হে শুনেছ ? বসন্ত কোলের কথা। স্বপ্নার মত মেয়ের নামে কুৎসা রটনা করছে। ছোট লোকের বড় কথা ? একজন গোবেচারী অসহায় মেয়েকে পেয়ে যা নয় তাই বলা ? জিভ বের কোরে নেবো না ? এই যে আমরা নেশা ভাঙ করি, কই আমাদের তো বলতে পারিস না ?"

অনেকেই কি কাণ্ড ঘটে দেখবার জন্যে অক্ষয়ের সাথে এগিয়ে চলে ; কেউ কেউ এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না, কারণ এরকম ঘটনা প্রায়ই তো ঘটে থাকে। এটা একরকম গা-সওয়া হোয়ে গেছে।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে অক্ষয় দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিতে দিতে আস্ফালন করতে থাকে। কিন্তু অপর পক্ষে সাড়া দেবার কোন লক্ষণ না পেয়ে সঙ্গীদের মধ্যে আস্ফালন করতে করতে ফিরে আসে।

স্বপ্নাদের বাড়ীর কাছাকাছি এসে হাতের কাঠটা ফেলে দিয়ে বেশ দম্ভভরে বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করে যায়। বাড়ীর সকলেই বেশ একটু ভয়ে ভয়ে ছিল, পাছে তাঁদের হোয়ে অক্ষয় বাউলে কিছু করে বসে। অক্ষয় মাধবীদেবীর পায়ের ধূলো নিয়ে বলে ওঠে "না মাসীমা, আপনাদের কোন ভাবনা নাই— আমি যখন আছি তখন শালাদের কেউ কিছু করলে একেবারে গর্দ্দানা নিয়ে নেবো না ? ভয়ে বসন্তটা ঘর থেকে বেরুলো না— তাই রক্ষে, নইলে এক্ষুণি একবার দেখে নিতাম।"

মাধবীদেবী তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করেন "অক্ষয়, বাবা, ওসব হাঙ্গামা কোরে কাজ নাই, এখন মাথা ঠাণ্ডা কোরে বাড়ী ফিরে যাও। কেউ গালাগালি দিয়ে ক্ষতি কিছু করতে পারে না। ভগবান যখন অসহায় কোরে রেখেছেন তখন

আমার বিশ্বাস আছে যে তোমরা আমাদের মন্দ বা অপকার কিছুই করবে না।”

অক্ষয় এবার আস্তে আস্তে মাধবীদেবীকে আর একবার প্রণাম করে উঠে পড়ে।

*　　　*　　　*

আজ কয়েকদিন হোলো মলয়ের মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। কিছুদিন যাবৎ জীবনবাবুর শরীর ভাল যাচ্ছে না। ডাক্তার এসে বিশ্রামের প্রয়োজনে অফিস থেকে ছুটি নেবার জন্য অনুবোধ করেন। কান্তাদেবী এ নিয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করলেও জীবনবাবু বিশ্রাম নিতে নারাজ—মুখে ব'লেন “যতদিন আছি কিছু উপায় করে যাই। ছেলের মতিগতি তো বোঝা যায় না—ওযে কিছু উপায় কোরে খেতে পাববে তা আমার বিশ্বাস হয় না।” মলয়ও পাশ থেকে পিতার কথা শুনে খানিকটা চঞ্চল হোয়ে ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই অন্য কাজের ডাক এলে সব ভুলে যায়।

ইদানীং জীবনবাবুর শরীরটা বাস্তবিকই বড় ভেঙ্গে পড়েছে। এর আগে মলয়ের বিয়ে নিয়ে জীবনবাবু বিশেষ মাথা ঘামান নি, এবারে নিজের অবস্থাব কথা ভেবে কান্তাদেবীকে ডেকে ছেলের বিয়ের সম্বন্ধে ছেলেকে তাড়া দেবার জন্য বলেন। কান্তাদেবীরও মনের কোণে ওই কথাই জেগেছিল। যেন বৌমাকে নিয়ে দুদিন

বেশী কোরে সংসারটা গুছিয়ে রেখে যান। মনে মনে ঠিক করেন সময়মত ছেলেকে একথা জানিয়ে দেবেন।

মলয় আজ ভেবে ঠিক করতে পারছে না সে কি করবে? বাবার শরীরটা ভাল নয়, আজ সত্য সত্যই তিনি অফিস যেতে পারেন নি। তাঁর কাছে একটু বসলে বেশ ভালই হয়। ওদিকে আবার নতুন শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করার ব্যাপার পড়ে রয়েছে, তারই সহকর্ম্মী ফণীকে যদিও ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া আছে তবুও তার নিজের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন, কারণ নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সব দিক ভেবে চিন্তে শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ কোরতে হবে—মাইনা বেশী দেবারও উপায় নাই।

আজকে আবার ময়দানে—মজুরদের বিরাট সংগঠনী সভা রয়েছে। সভায় বক্তৃতা করবে সত্যেন নিজে ও তার সহকর্ম্মীরা; সভার আদর্শ সম্বন্ধে জানবার অনেক কিছু আছে।

মলয় এতদিন সত্যোনের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জেনে উঠতে পারে নি। সত্যেনের সত্যই মহৎ হৃদয়, তারই দেওয়া মোটা টাকায় মলয় তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। তার সম্বন্ধে বিশেষ জানবার এই সুবর্ণ সুযোগ। হঠাৎ কান্তাদেবীর পায়ের শব্দে মলয়ের চিন্তায় ছেদ পড়ে। কান্তাদেবী এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে চিন্তিত মলয়ের মাথায় হাত বুলাতে থাকেন। মলয়ও একটা গভীর শান্তির নিশ্বাস ফেলে।

কান্তাদেবী এবার আব্দারের সুরে বলে ওঠেন "মলয় বাবা, ওঁর শরীর যেরকম দিন দিন খারাপ হোয়ে চলেছে, আমি তো ভেবে ঠিক করতে পারছি না যে কি করবো ? এবার তোমার ঘর সংসার দেখতে হ'বে তো ? আর কতদিন এ ভাবে বাইরে বাইরে কাটাবে মলয় ?"

মলয় একেবারে আকাশ থেকে পড়ে যায়। এ কথায় কি উত্তর দেবে ? পিতার অসুস্থতা সত্যই তাকে বেদনায় ভরিয়ে দেয়। মলয়কে চুপ করে থাকতে দেখে কান্তাদেবী ভরসা করে বলে ওঠেন "বাবা মলয়, এবার একটা বিয়ে থা কর। ওঁরও তাই ইচ্ছা, এতে আর তুমি অমত কোরো না যেন।" মলয় মায়ের পানে তাকাতে থাকে যেন কত অপরাধই না সে এতদিন কোরে বেড়িয়েছে ! কিন্তু কি বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে থাকে। কান্তাদেবী মলয়ের অবস্থা দেখে হেসে ওঠেন "এতে আর ভয় কি মলয়, এতো সংসারের চিরন্তন নিয়ম। বয়স হোলেই দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে হবে। আর তুমি তো তেমন ছোটটি নেই যে ভয় কি লজ্জা পাবে ? তা হলে আমি ঠিক করে ফেলিগে। ওকে বলে দিগে যে মলয় রাজী আছে।"

নিরুত্তর মলয়ের কাছে .আর অপেক্ষা না করে কান্তাদেবী স্বামীর উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

কি তার বলার ছিল অথচ বলা হোলো না—এই নিয়ে

মলয় অনেক ক্ষণ একা একা বসে ভাবে। তারপর হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়, ঘড়ি দেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে। যদিও এর আগে স্কুল সম্বন্ধেই মলয় বেশী চিন্তিত হোয়ে পড়েছিল কিন্তু এখন মায়ের প্রস্তাবে আর অন্য কথা না ভেবে সোজা সভার উদ্দেশ্যে ময়দানাভিমুখে যাত্রা করে।

মলয় যখন পৌঁছালো তখনও সভার অনেক দেরী। ইতিমধ্যে সত্যেন ও আরও অনেকে এসে পৌঁছে গেছে। মলয় তাদের সঙ্গে দেখা করতে চলে যায়।

সত্যেন মলয়কে দেখে বেশ উৎফুল্ল হয়েই অভ্যর্থনা জানায়—"তারপর মলয়—তোমার স্কুল কেমন চলছে? স্বপ্নার খবর কি?" মলয় উত্তর দেয় "না ভাই সত্যেন, আর কিছু ভাল লাগে না, বাবার শরীরটা ভীষণ খারাপ, তাই ভাবছি কি কোরবো। চাকুরী নেব না সব ছেড়ে ছুড়ে একটা ব্যবসা-পত্রে লেগে যাবো?"

সত্যেন বিস্ময়ে মলয়ের পানে তাকাতে থাকে "মলয়, তুই কি বলছিস্? এরই মধ্যে সব ছেড়ে ছুড়ে দিবি কিরে? আরো কিছু দিন স্কুলটাকে দেখ, নইলে যে ওস্কুল নষ্ট হয়ে যাবে। আর তা ছাড়া স্বপ্নার সম্বন্ধেও তোর ভাবনা আছে। স্কুল না চললে, তার অন্নের রাস্তা যে একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে রে!" মলয়ের মুখ হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে যায়।

একদিন ছিল যখন স্বপ্নার সম্বন্ধে অনেক কিছু ভাববার সময় তার ছিল, তখন উৎসাহও কম ছিল না। কিন্তু আর কতদিন স্বপ্নাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে বেড়াবে? স্বপ্নাকে বিয়ে করতে সে সব সময়েই রাজী আছে—কিন্তু আজকাল স্বপ্নার ততখানি সাড়া মেলে না। কোথা হোতে নাকি এক বিরাট বড় লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্বপ্নার মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে। সত্যই তো, অবস্থাপন্ন স্বামী কে না চায়? প্রেমের গভীরতা যতই থাকুক না কেন—ভাল মন্দের বিচার এক মোহে অন্ধ ছাড়া সকলের কাছেই স্থান পায়। দুঃখের আঘাতে প্রেম চিরস্থায়ী হো'তে নারাজ, হয় তাকে সমস্ত আশা ভরসা ছেড়ে দিয়ে মিলতে হ'বে প্রেমিকের মরুভূমিতে, না হয় সমস্ত আবেগে জলাঞ্জলি দিয়ে নতুন রাস্তা তৈরী কোরে নিতে হ'বে।

স্বপ্না আজ কোন পথে চলবে কে জানে? মলয়ের নিস্তব্ধতা লক্ষ্য করে সত্যেন এবার হেসেই বলে ওঠে "কিরে মলয়, মিলনে কোন বাধা আছে না কি?"

মলয় এবারে বেশ জোরেই হেসে ওঠে "প্রেম তো আর বাস্তবের হাত ধরে চলে না যে খুসী মত তাকে ঘরের কাজে লাগাবে?"

সত্যেনের আরও কিছু বলবার ইচ্ছা থাকলেও সভার তাগিদে আর বলা হয় না। মলয়ও আস্তে আস্তে সভার

ভীড়ের মাঝে মিশে যায়। যথাসময়ে সভার কাজ আরম্ভ হয়।

এতক্ষণ কেউ লক্ষ্য করে নি যে দুটী বিশাল অবাঙ্গালী মলয়ের পাশে পাশেই ঘোরাফেরা করছে। কি তাদের উদ্দেশ্য কে জানে? মলয়ের সঙ্গেও এক আধবার তাদের দৃষ্টি বিনিময় ঘটেছে। কারণ, এরা এ সভায় অন্যান্য লোকের তুলনায় যেন কিছুটা স্বতন্ত্র। চোখের চাহনিও বিশেষ ভাল নয়। মলয়ের মনে পড়ে যায় মালিকদের গুণ্ডা দিয়ে সভা ভেঙ্গে দেবার কথা। কিন্তু এত লোক যখন বিশেষ মাথা ঘামায় না তখন মলয়ের অত দুর্ভাবনা কিসের। কিন্তু সভা আরম্ভ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভীড়ের মধ্যে থেকে হৈ চৈ পড়ে যায়। সকলেই সেইদিকে ছুটতে থাকে। সত্যেন সকলকে থামাতে থামাতে এগিয়ে আসে। সত্যেন ভীড়ের মধ্যে থেকে একটু জায়গা করে নিতেই হঠাৎ দেখতে পায় মলয়ের রক্তাক্ত শরীর ধূলায় লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে মাথাটী কোলে তুলে নেয়, তারপর "এম্বুলেন্স! এম্বুলেন্স!" বলে চীৎকার করে ওঠে। যারা ভীড় করেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই আস্ফালন করতে থাকে—"এ নিশ্চয়ই বাবুদের কাজ,—একবার জানতে পারলে দেখে নিতাম।"

সত্যেন এম্বুলেন্সের দেরী আছে দেখে তাড়াতাড়ি জল

আনতে আদেশ করে। এতক্ষণে রীতাদেবী, সুমিত্রা সকলেই ঘটনাস্থলে এসে পড়ে।—সকলেই মলয়ের অবস্থা দেখে রীতিমত ভয় খেয়ে যায়। সত্যেন সান্ত্বনার সুরে মলয়কে আশ্বাস দিতে থাকে। মলয় একবার চোখে চেয়ে পরক্ষণেই অজ্ঞান হোয়ে যায়। কয়েকটি কথা কেবল জড়ান অবস্থায় মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে "সত্যেন সভা বন্ধ করিসনে ভাই—তুই আবার বল—নানা দাবী আমাদের বাঁচবার—আমরা বাঁচবই।" এম্বুলেন্স এসে যাওয়ায় সত্যেন তাড়াতাড়ি মলয়কে ধরে গাড়ীতে তুলে দেয় ও সাথে সাথে নিজেও গাড়ীতে উঠে বসে। সত্যেন এতক্ষণ চিন্তা করার সুযোগ পায় নি কেমনে এ সম্ভব হোলো। তেমন কোন প্রতিবাদের ব্যাপার তো সত্যেনের মনে পড়ে না—আর তা ছাড়া মলয় তো এ দলের কেহ নয়। যাই হোক, হয়ত ভুল বশতঃ অত্যাচারী মলয়কেই আঘাত কোরে ফেলেছে। এখন মলয়কে বাঁচানোই তার প্রধান কাজ।

হাসপাতালে মলয়কে যথারীতি ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়। কোন কোন চিকিৎসক অবস্থা দেখে মুখ বাঁকিয়ে সড়ে পড়েন। কেউ কেউ আবার একটু আধটু আশা জোগান। সত্যেনের দুশ্চিন্তা ক্রমশঃ বেড়ে ওঠে—তবে কি মলয়—আর ভাবতে পারে না সত্যেন।

দিন দিন উৎকণ্ঠার মধ্যে মলয়ের জীবনের আশঙ্কা কাটতে

থাকে। সভার উদ্যোক্তা হ'তে আরম্ভ করে অনেকেই মলয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে হাসপাতালে ভালমন্দ খোঁজ নিতে আসে।—রোজই আসে সত্যেন, নানা জনের নানা প্রশ্নসঙ্কুল পরিবেষ্টনীর মধ্যে। যখন সত্যেন হাসপাতালে খবর নিতে আসে তখন বেশ দ্রুত বেগেই প্রবেশ করে যায়, কিন্তু রোগীর শয্যার কাছে এসে থমকে দাঁড়াতে হয়—পার্শ্বের ইঙ্গিতে বেশ সহজ ও ধীরভাবে পা ফেলতে ফেলতে আবার বাহির হোয়ে যায়। চিকিৎসকের কাছে রোগীর অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করে—কখনও একটু ক্ষীণ আশা নিয়ে নীচে নেমে যায়।—

তারপর আসেন মলয়ের বৃদ্ধ পিতা জীবনবাবু। বাড়ী থেকে যখন যাত্রা করেন তখন বেশ দ্রুত পদক্ষেপেই হাসপাতালের উদ্দেশ্যে চলতে থাকেন, কিন্তু হাসপাতালের মধ্যে এসে আর যেন পা কিছুতেই চলতে চায় না; কোন রকমে সিঁড়ির রেলিং ধরে ওপরে উঠতে থাকেন—অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয় আর যেন কিছুতেই সান্ত্বনা পায় না। পাশে ফণী খুব মন্থর গতিতে বৃদ্ধকে ধরে নিয়ে ওপরে উঠে যায়।—কাছাকাছি এলে বৃদ্ধ আর স্থির থাকতে পারেন না—কোথা থেকে যেন বুকফাটা কান্না বেরিয়ে আসতে চায়। অবস্থা বেগতিক দেখে চিকিৎসকের পরামর্শে ফণী আবার ধীর পদক্ষেপে বৃদ্ধকে নীচে নামিয়ে দেয়।

সবশেষে যে আসে সে স্বপ্না। সেদিন মলয়ের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, তবে বিপদ সম্পূর্ণ কাটে নাই। স্বপ্নার হাতে এক গোছা ফুল বেশ সুগন্ধে ভরা—আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় রোগীর বিছানার কাছে। হঠাৎ মলয় একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখে। স্বপ্নাকে দেখে প্রথম যেন চিনতেই পারে না—তারপর আস্তে আস্তে ভাল করে নিরীক্ষণ করতে করতে ফুলগুলোর দিকে নজর পড়ে যায়। কি যেন হোয়ে পড়ে। মলয় চেঁচিয়ে ওঠে "না—না—না আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। আমি চাই না, চাই না, চা—ই না।" ক্ষণেকের মধ্যেই আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে। নার্সরা ছুটে আসে—চিকিৎসকেরা চমকে ওঠে।

স্বপ্না বিব্রত হয়ে চোখের জল ফেলতে থাকে। রীতাদেবী পাশে বসে সেবা করছিলেন, রীতিমত ভয় খেয়ে যান; স্বপ্নাকে ইঙ্গিত করে সরে যেতে বলেন। স্বপ্না মূঢ় ম্লান মুখে চোখের জলে ফুলগুলোকে বুকে চেপে ধরে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পরে মলয় ধীরে ধীরে চোখ মেলে চায়। পাশে রীতাদেবীকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে এদিক ওদিক চাইতে থাকে, "এই তো স্বপ্না ছিল, কোথায় গেল?" আরও স্পষ্ট ভাবেই জিজ্ঞাসা কর—"স্বপ্না এসেছিল না? কোথায়

গেল ? আমি কি—?” আর কথা বলতে পারে না ; চোখের জল আর উচ্ছ্বাসে সমস্ত কথা চাপা পড়ে যায়। রীতাদেবী সান্ত্বনা দিতে থাকেন “ভয় নেই মলয়বাবু, আপনি সেরে উঠুন সব ফিরে পাবেন ; এখন আপনি অসুস্থ, বেশী উতলা হওয়া ভাল নয়।” মলয়ের চোখ আপনা হোতেই বুজে আসে—মলয় ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়ে।

দিনের পর দিন মলয় নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্যে আরোগ্যের পথে এগিয়ে চলেছে। ছুরির আঘাত দেহের যে জায়গায় লেগেছিল, তার একটু ওপরের দিকে লাগলেই নাকি আর আশা ভরসা থাকতো না! যাই হোক একটু বিবেচনার অভাবেই গুণ্ডার দল শেষ পর্য্যন্ত সুবিধা করে উঠতে পারে নি।

সকাল থেকেই মলয় বেশ সুস্থ বোধ করছিল। বিকালে যথানিয়মে দর্শনপ্রার্থী হিসাবে স্বপ্না ও সাথে মধুকরবাবু এসে হাজির। মলয় বালিশের ওপর মাথাটা রেখে আধশোয়া অবস্থায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে ছিল। হঠাৎ স্বপ্নাকে দেখে নড়ে চড়ে উঠে বসে। স্বপ্নাও বেশ লজ্জিতভাবে বিছানার একপাশে এসে বসে পড়ে। তখনও স্বপ্নার মনে বেশ আশঙ্কা ছিল—এই তো সেদিন মলয় কি অপমানই না তাকে করেছে। মধুকরবাবুর দর্শনে মলয় বেশ খানিকটা অস্বস্তি অনুভব করে। কিন্তু মধুকরবাবুর চালচলনে সত্যই

ভদ্রতার ও সুষ্ঠু মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। দেখলে মনে হয় বিনয়ের মূর্ত্ত প্রতীক।

এবার বেশ রসিকতা কোরেই মধুকরবাবু বলে ওঠেন "যাই হোক মলয়বাবু, আপনার একটা মস্ত ফাঁড়া কেটে গেল।" সাথে সাথে স্বপ্না বলে ওঠে "মলয়দা, আর ওরকম ভীড়ের মাঝে যাবেন না। মিছামিছি গণ্ডগোলে গিয়ে লাভ কি? আমার ভয়ানক ভয় করে। আচ্ছা যারা এ কাজ করলো পুলিশ কি তাদের ধরতে পারে না? এতবড় অন্যায় যারা করে তাদের রীতিমত শাস্তি দেওয়া উচিত।"

এতক্ষণের কথাবার্ত্তায় মলয় মধুকববাবুর মধ্যে একটু সলজ্জ ভাব প্রকাশিত হ'তে দেখে উৎসাহের বশে বলে ওঠে—"না স্বপ্না, এ এমন কিছুই নয়। বাঁচতে গেলে হয়ত এর চেয়ে আরও বেশী বিপদের সম্মুখীন হ'তে হ'বে—কে জানে?" এবাব সত্যেন বেশ হাসিমুখেই প্রবেশ করে। ওদের দুজনকে বসে থাকতে দেখে কৌতূহলী মনে এগিয়ে আসে। সত্যেন মধুকরবাবুর উপস্থিতি খুব প্রীতির চোখে না দেখলেও স্বপ্নার সান্নিধ্য বেশ সহজ মনেই গ্রহণ করে। নমস্কার আর প্রতি নমস্কারের মধ্য দিয়ে সত্যেন আর মধুকবাবুর আলাপ পরিচয় ঘটে যায়।

মধুকরবাবুর কথায় যে মিষ্টতা আছে তা সত্যেন হাজার

চেষ্টা করেও বেশ সরল মনে গ্রহণ করতে পারে না—সত্যেনের কেবলই মনে হয়—মধুকরবাবুর সাথে পরিচয় না হোলেই ভাল ছিল। মনে হয় যেন কি এক বিরাট ফাঁকি এই ভদ্রলোকের মধ্যে লুকিয়ে আছে। অযাচিত ঘনিষ্ঠতাই তার একমাত্র কারণ কি? কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে ওসব কথা মনে আনলে চলবে না—তাই সত্যেন অল্প কথায় বাহিরে থেকে ভেতরের মানুষটাকে চেনবার চেষ্টা কোরে হাসপাতাল হোতে বেরিয়ে যায়।

সত্যেন এখন বিরাট সংগঠনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। ভারত-জোড়া তার কর্ম্মক্ষেত্র, প্রদেশে প্রদেশে শাখা-প্রশাখাতে সাম্যবাদই মোটামুটি তাহার সকল কর্ম্ম-প্রেরণার আদর্শ। মহিলা বিভাগীয় সম্পাদক হিসাবে রীতা দেবী তার অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন।

এখন সত্যেন সাধারণ মধ্যবিত্ত থেকে মজদুর ও কৃষি জীবনের উন্নতিকে পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা কোরে চলে। মাঝে মাঝে অর্থের অভাব ও কর্ম্মী সংযোগ নিয়ে তাকে বেশ চিন্তিতও হোতে হয়। কিন্তু কোন কিছুই তাকে স্বীয় কর্ত্তব্য থেকে ভ্রষ্ট করতে পারে না—এমনই তার একাগ্র সাধনা।, এখন সাধারণ জীবনের ছোটখাট ব্যাপারগুলো তাকে বিশেষ করে জড়িয়ে রাখতে পারে না। তবুও সময়ে

অসময়ে অনেক সাংসারিক পরিস্থিতি নিয়ে তাকে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও মাথা ঘামাতে হয়। যাদের জয়গান সে করবে তারাই যখন এখনও নিজেদের বিভেদ দূর কোরে নিতে অক্ষম তখন সত্যেনকে সে সমাধান নিয়ে মাথা ঘামাতেই হবে—অন্য কোন উপায় নাই।

সারাদিন কাজ কর্ম্মের পর যখন একটু বিশ্রামের সময় হয় তখন সত্যেনকে দেখলে সত্যই করুণার উদ্রেক হয়! প্রচুর সুখ স্বচ্ছেন্দ্যের মাঝে যে জন্মগ্রহণ করেছে সে কি করে এত সহজে সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে নিজেকে অক্লান্ত পরিশ্রমী করে তুলেছে? কি তার পাবার আশা? মানুষের দুঃখ তো চিরন্তন! তাকে ঘোচাতে তার এ প্রচেষ্টা কি কাজে লাগবে? তা কে জানে? সত্যেন এখন মজদুরদের এক বিপুল সংগঠনে হাত দিয়েছে, সে জন্য নিত্য নূতন খসড়া রচনায় ব্যস্ত আছে।

হঠাৎ সকলকে চমকে দিয়ে অতি প্রিয় অনুচর গোবিন্দ এসে হাজির। অন্যান্য কর্ম্মী অপেক্ষা এই গোবিন্দ স্বতন্ত্র প্রকৃতির,—রাজনীতির কচকচানি অপেক্ষা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাওয়ার মধ্যেই বেশী আনন্দ পায়। কোন কিছুতেই তার এতটুকু দুশ্চিন্তা দেখা দেয় না। কর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন মতাবলম্বীর কাছে অনেক সময় গালিগালাজ—এমন কি প্রহার পর্য্যন্তও

তাকে আপন কর্ত্তব্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে নাই। সাধারণ ভাবে আজ সেও নিজকে সত্যেনের কর্ম্মধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিয়েছে। থাকার মধ্যে সঙ্গে কেবল তার বৃদ্ধ পিসিমা, যার ভরণপোষণের ব্যবস্থার কথাই তাকে মাঝে মাঝে চিন্তিত কোরে তোলে। নইলে আর কোন কিছুই তাকে আকর্ষণ করতে পারে না।

আজ স্বপ্নাদের বস্তিতে কতকগুলি চিঠি বিলি করতে গিয়ে হঠাৎ শুনতে পায়—এক বয়স্থা বিধবা মহিলা ফিস ফিস করে দু একজন মজুরকে কি সব বোঝাতে চেষ্টা করছে। কথার মধ্যে প্রকাশ পায় মহিলাটীর নাম শোভা—সত্যেনকে এবার সে স্পষ্ট করে বলে চলে "মহিলাটি—মানে শোভাদেবীর মধ্যে বুদ্ধিতে বা চালচলনে যেন একটু বিশেষত্ব আছে বলে মনে হয়।"—তবে এর বেশী সে আর কিছুই বলতে পারে না।

সত্যেন তেমন কোন বিশেষ তথ্যের সন্ধান না পেয়ে চুপ করে যায়। এদিকে আবার দূঢ় প্রান্তের সংগঠনগুলির মধ্যে যোগা.যাগ রাখবার অনেক কাজ বাকী পড়ে রয়েছে। হয়ত কিছুদিনের জন্য বাড়ী ছেড়ে বাইরেও থাকতে হোতে পারে। এখন তার এক মুহূর্ত্ত আর অন্য কোন চিন্তা করলে চলে না।

আজকাল• মধুকরবাবুর বাড়ীতে স্বপ্নার যাতায়াত বেশ ঘন ঘনই হোতে থাকে। অনেক সময়ে স্কুল কামাইও যে হয় না তা

নয়। কারণ ওই মায়া—কি হতভাগ্য তার জীবন! মায়া নাকি স্বপ্নাকে ছাড়া ভাল কোরে খাওয়া দাওয়া করে না। এমন কি সময়ে সময়ে জিনিষপত্র ভেঙ্গে তচনচ কোরে ফেলে। মধুকর বাবুর একান্ত অনুরোধেই স্বপ্নাকে আজ এই দুঃখী মহিলাটীর প্রতি কিছুটা সহৃদয়তা দেখাতে হয়।—তবে মায়ার প্রয়োজনের অতিরিক্ত আর বেশীক্ষণ মধুকরবাবু বাড়ীতে থাকতে চায় না। মধুকরবাবু প্রশংসা করতে করতে অনেক দূর এগিয়ে গেলেও মাঝপথে স্বপ্নার আপত্তিতে তাকে সাময়িক ভাবে নিবৃত্ত থাকতে হয়। "এই দেখুন স্বপ্নাদেবী, আপনি আমার জন্য এত কিছু করেন। অথচ একদিনও আপনাকে ভালভাবে আতিথ্য গ্রহণ করাতে পারলাম না। আজ কিন্তু আপনাকে একটু বেশীক্ষণ থাকতে হবে। কিছু না খেয়ে গেলে আজ আর ছাড়ছি না। আর তা ছাড়া এ ঘরের যাবতীয় ভার আপনাকে একদিন না একদিন নিজের হাতে তুলে নিতে হ'বে। তখন অত আপত্তি—"

কথা শেষ হোতে না দিয়ে স্বপ্না বলে ওঠে "না—না ও কথা এখন থাক। আমার দেরী হয়ে গেছে, আবার মলয়দা জানতে পারলে রাগ করবেন।" মধুকরবাবু মলয়ের নাম শুনে বেশ রাগত হোয়ে ওঠেন—মুখে ও ভাব না দেখিয়ে বলে ওঠেন "স্বপ্না, তুমি এত কিছু করে আমায় শেষে ভাগিয়ে দিতে চাও?

আমার জীবনটা কি তোমার কাছে এতই তুচ্ছ, এতই অবহেলার? বেশ—যদি এই ইচ্ছাই তোমার থেকে থাকে তাহলে আর আমার এখানে থাকা চলে না। মায়া রইল, তোমার দয়া হোলে ওকে দেখাশোনা কোরো। আমি আর কোথাও চলে যাবো।" বলিয়া মধুকর বাবু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

স্বপ্না প্রথমটা একটু লজ্জায় জড়িয়ে পড়ে। পরক্ষণেই বলে ওঠে "না না সেকি কথা, আপনি কেন মিছামিছি এজায়গা ছেড়ে চলে যাবেন? যদি যেতে হয় আমাকেই যেতে হ'বে। আর তা ছাড়া আমার মতন একজন হতভাগিনীকে ভালবাসার কি কোন মূল্য আছে মধুকরবাবু?"

মধুকরবাবু এবার হেসে ওঠেন "আছে স্বপ্না, আছে। যাকে আমি আমার অন্তরের অন্তস্থলে একবার স্থাপন করি তাকে আর কোন অবস্থাতেই সেখান থেকে নাবিয়ে আনা চলে না। আমি জানি স্বপ্না, তুমি মলয়বাবুকে বেশী প্রীতির চক্ষে দেখো, কিন্তু মলয়বাবুর সব আছে, ইচ্ছা করলে তিনি দেশের কাজ নিয়ে সারা জীবন চালিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু আমার? আমার কি সম্বল আছে যা দিয়ে আমি আবার সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি? আমার চোখের সামনে আমার ভাগ্যের ব্যাপারে যা দেখতে পাই সে এক টুকরো হালকা

কাঠের মতন স্রোতের মুখে ভেসে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।—অদ্ভুত এই পরিণতি—হা—হা—হা!"

স্বপ্না ক্ষণেকের তরে বিহ্বল দৃষ্টিতে মধুকরবাবুর দিকে চেয়ে থাকে। হঠাৎ মলয়ের কথা মনে পড়ায় তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড়টা ঠিক করে নিয়ে নিম্ন দৃষ্টিতে বেরিয়ে পড়ে। মনের মধ্যে অনেক কিছুরই চিন্তা খেলে যায়। এক একবার মনে হয় যেন এ লোকটার সাথে পরিচয় না হোলেই ভাল ছিল। এর আকর্ষণ এখন স্বপ্নাকে অনেকখানি পেছন দিকে টানতে সুরু করেছে। কোথায় এর শেষ কে জানে?

বাড়ীর কাছে এসে গাড়ী থামতেই স্বপ্না ব্যস্ত ভাবে নেমে বাড়ীর ভিতর ঢুকে যায়। মাধবীদেবীকে দেখে স্বপ্না আর স্থির থাকতে পারে না। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে, অঝুর নয়নে কাঁদতে থাকে। মাধবীদেবীও খানিকটা অবাক্ হয়ে যান। মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে দিতে সব কথা শোনেন। আজ আর কোন কথা মায়ের কাছে স্বপ্না গোপন রাখে না। মেয়েদের স্বভাবই এমন যে অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে তাকে কিছুতেই চেপে রাখতে পারে না। ভাগ্যের উপরে অনেকখানি চাপিয়ে দিয়ে মাধবীদেবী মেয়ের চোখের জল মুছিয়ে দেন। সত্যই তো, ভাগ্যের বিড়ম্বনা না থাকলে এই অল্প বয়সে পিতৃহারা অবস্থায় একলাই কেন সমস্ত ব্যাপারে সমাধানের জন্য পথ খুঁজে বেড়াতে হ'বে?

আজ সকাল থেকেই মলয়কে যেন ছুটাছুটী করতে দেখা যায়। জীবনবাবুর অসুখটা একটু বাড়াবাড়ি। এই কতক্ষণ হোল ডাক্তারবাবু জানিয়ে গেছেন—এখন সেবাটা ঠিক মতন হোলেই ভাল হয়, নইলে জীবনের আশঙ্কা অনেকখানি। বরফ আর ডাবের ব্যবস্থা কোরে দিয়ে মলয় তাড়াতাড়ি ওষুধ আনতে বেরিয়ে পড়ে। যাবার পথে স্বপ্নাকে খবরটা জানাবার উদ্দেশ্যেই একবার স্বপ্নাদের বাড়ী প্রবেশ করে। স্বপ্না নাই সকালবেলাই গাড়ী এসেছিল, চলে গেছে। মলয় একবার ভাবে মাধবীদেবীকে অসুখের কথাটা জানিয়ে দেয়, কিন্তু পরক্ষণেই মধুকরবাবুর কথা মনে আসতেই আর বলা হয় না। তাড়াতাড়ি বাড়ী হোতে বেরিয়ে আসে।

পথে চলতে গিয়ে স্বপ্নাকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তাই মনের মাঝে খেলে যায়। কিন্তু এখন ভাবনার সময় খুব অল্প তাই তাড়াতাড়ি ওষুধ নিয়ে বাড়ী ফিরে যায়।

বাড়ীতে এসে কান্তাদেবীর চোখের জল দেখে সবিশেষ খবর নিয়ে ডাক্তারবাবুর উদ্দেশ্যে আবার ছুটতে থাকে। একদিন দুদিন, তিনদিন ক্রমাগত পরিশ্রম আর রাত্রি জাগরণের মধ্যে প্রাণপণে পিতার সেবা যত্ন চলতে থাকে। রোগীর অবস্থা কিন্তু ক্রমাগত খারাপের দিকেই চলেছে। আজ অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থা—জীবনবাবু মলয়কে ডেকে কাছে বসিয়ে

অনেক কথা বলতে থাকেন। মলয়ের অশ্রু-ভারাক্রান্ত হৃদয় কিছুই যেন শুনতে পায় না। .

"মলয়, কিছু ভেবো না—সংসারের নিয়মই এই। হরিসাধন-বাবুর কথা আমার এখনও মনে পড়ে। স্বপ্না রইলো যদি কোন আশ্রয় না মেলে তো তুমি নিজেই আমাদের—আমার ঘরের বৌ সাজিয়ে নিয়ে আসতে পারো, এতে কোন লজ্জা নেই। আমি জানি তোমাদের মধ্যে আমাদের দু বন্ধুর মতন অনেক দিনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে। স্বপ্না মা হয়ত লজ্জায় আসতে পারে না। যাই হোক, তুমিই তাকে আমার কথাগুলো জানিয়ে দিয়ো, আর বোলো যে আমি ওপার থেকেও তাকে আশীর্ব্বাদ করব। তোমাদের মঙ্গল আমার ও তোমার মায়ের আশীর্ব্বাদে পূর্ণ হয়ে উঠুক—।" শেষের কথাগুলো বেশ ক্ষীণ ভাবেই শোনা যায়, দম যেন ফুরিয়ে আসতে চায়। মলয় ধীরে ধীরে পিতার বুকে হাত বুলিয়ে দেয়। হঠাৎ সমস্ত অন্ধকার কোরে জীবনবাবু নিস্তেজ হোয়ে চোখ বোজেন।

মলয়ের কাছে সমস্ত পৃথিবী যেন শূন্যে ঘুরতে থাকে। চোখের জলে যেন সমস্ত বুক ভেসে যায়। সব শেষ! এখন মৃতদেহ সৎকার করার তোড়জোড় এসে পড়ে। মলয় চুপ করে দাওয়ায় একধারে বসে থাকে। স্বপ্না কখন নীরবে তার কাছা-কাছি এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে খেয়াল হয় না। চোখ তুলে চেয়ে

দেখে স্বপ্না দাঁড়িয়ে আছে, ঘরের ভিতরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে দেয়। উভয়েরই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে। অভিমানে স্বপ্না যেন ফেটে পড়ে—একবার শেষ দেখার আশাও পূরণ হোলো না? এবার স্বপ্না মনের আবেগে ঘরের ভিতর ঢুকে যায়। কান্তাদেবী শোকে মুহ্যমান, কে কাকে সান্ত্বনা দেয়?

প্রকৃতির খেলাঘরে যে যখন আসে সে ধীরে ধীরে অনেকের মনেই আসন পেতে বসে যেন যাবার সময় অনেকের চোখের জলে নিজেকে স্মৃতির মাঝে বাঁচিয়ে রাখা যায়। ছোট-বড় সকলের খেলাই সেদিকে প্রায় এক রকম—এইটাই জগতের নিয়ম।

সত্যেন আজ এক ঘরোয়া বৈঠকের আয়োজন করেছে। দেশের পরিস্থিতি বিশেষভাবে , সমালোচনার জন্য বাংলার বাইরের দু'একজন নেতৃস্থানীয় কর্ম্মীও আজ এই বৈঠকে অংশ গ্রহণ করবে। দিন দিন দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা খারাপের দিকে গড়িয়ে চলেছে। কি কর্ম্মপদ্ধতির মাধ্যমে এ অবস্থার উন্নতি হবে সেই ব্যাপারে সকলেই বিশেষ চিন্তিত।

তাই এ সভার প্রধান উদ্দেশ্য হবে দেশের এই দুরবস্থার প্রতীকারকল্পে একটা স্থায়ী কর্ম্মপন্থানির্দ্ধারণ। এ সময়ে মলয় কি কাজে এসে সভায় মধ্যে উপস্থিতি অসঙ্গত ভেবে বাইরের

ঘরে বসে রীতাদেবীর সঙ্গে কথা বলছিলো। সত্যেনের সাথে আজ একটু জরুরী প্রয়োজন, দেখা না কোরলে চলবে না। তাই অনিচ্ছা সত্বেও কিছুক্ষণ বাইরে বসে থাকতে হ'বে।

হঠাৎ এক ভদ্রমহিলা প্রবেশ করলেন। মহিলাটী এদিক ওদিক চাইতে চাইতে রীতাদেবী আর মলয়কে বসে থাকতে দেখে সেইদিকে এগিয়ে আসেন। মহিলাটীর সাজ সজ্জায় আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ পায়। হাতের ব্যাগ থেকে একবার রুমালটা নিয়ে মুখ মুছে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন "এইটাই কি কমরেড সত্যেনবাবুর অফিস?" রীতা-দেবী এবার ঘাড় নেড়ে প্রশ্ন করেন "কি দরকার আমায় বলতে পারেন, সত্যেনবাবু একটু ব্যস্ত আছেন।"

মহিলাটী একটু ইতস্তত: করে বলেন "তাঁর সাথে একটু ব্যক্তিগত প্রয়োজন আছে।" কথার শেষে একটী চেয়ারে বসে পড়েন। মলয় ও রীতাদেবী দুজনেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে মহিলার দিকে তাকাতে থাকেন।

মহিলাটীর বয়স খুব বেশী বলে মনে হয় না, তবে নানারূপ সাজ সজ্জার আতিশয্য ভেদ করে বয়স ঠিক ঠিক অনুমান করাও কঠিন ব্যাপার। হঠাৎ আগন্তুকের উপস্থিতিতে মলয় আর রীতাদেবীর মধ্যে কথাবার্ত্তা বন্ধ হোয়ে যায়।

ভদ্রমহিলাটী হাতের ঘড়ি দেখতে দেখতে বলে ওঠেন

"একটা শ্লিপ পাঠাতে পারেন কি? কারণ আমার আবার একটা বিশেষ জরুরী কাজ আছে, একটু আগে যেতে পারলেই ভাল হয়।" রীতাদেবী কি করবেন ভেবে ঠিক করতে পারেন না। হাতের পেন্সিল আর কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকেন। ভদ্র মহিলার জেদেই রীতাদেবীকে বাধ্য হয়ে শ্লিপ লিখে পাঠাতে হয়।

সত্যেন এসে অচেনা ভদ্রমহিলাটীকে দেখে একটু চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় জিজ্ঞাসা করেন "কি প্রয়োজন?" মহিলাটী একটু নিরিবিলি আবহাওয়া খুঁজতে থাকেন। সাথে সাথে মলয় আর রীতাদেবী বাইরে চলে যান।

এবার সাহস ভরে ভদ্রমহিলা বলে চলেন "আচ্ছা সত্যেন-বাবু, আপনি তো খুব বড় বড় বক্তৃতা দেন, দেশের কাজও করেন, দয়া কোরে আমার আর সর্ব্বনাশ নাই বা করলেন?" ভদ্রমহিলার কথায় সত্যেন বিশেষ আশ্চর্য্য হোয়েই জিজ্ঞাসা করে "আপনার কি সর্ব্বনাশ আমি করলাম, তাই বলুন।"

ভদ্রমহিলা এবার একটু নাকি সুরে বলে ওঠেন "সর্ব্বনাশের আর কি বাকী আছে তাই বলুন? আপনি তো মজুর ক্ষেপিয়েই খালাস। এদিকে আমার অবস্থা যে ক্রমশ সঙ্গীন হোয়ে পড়ছে।"

কথার মাঝে যে কি হেঁয়ালি থাকতে পারে সত্যেন ঠিক বুঝে

উঠতে পারছে না—তাই কেবল অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে মহিলাটীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

এবার আরও পরিষ্কার কোরে ভদ্রমহিলা বলে ওঠেন "আজ প্রায় দুবৎসর যাবৎ হরেন বাড়া আমার সংসার চালাচ্ছিল, আমিও তার যথেষ্ট উপকার কোরে দিই অবশ্য। কিন্তু আজকাল তো আর সে ওদিকে মাড়ায় না, ঘরের ছেলে বৌকে খাওয়াতেই ব্যস্ত। যদি এভাবে ধর্ম্মঘট চালাতে থাকেন তো আমাদের মতন অসহায় মেয়েরা যে মারা পড়ে। আমার অনুরোধ, যদি আপনি ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে একটু নরম পন্থা অবলম্বন করেন তো বিশেষ উপকার হয়। আমরা খেয়ে পরে বাঁচতে পারি।"

সমস্ত কথা শুনে সত্যেনের মন ঘৃণাতে ছেয়ে গেল। কিন্তু ঘৃণা থাকলেই চলবে না, এতদিন অনেক রকম বাধা সে উপেক্ষা করে এসেছে। সামান্য একজন মেয়ের ছল চাতুরী সে উপেক্ষা করতে পারবে না ?

কি আস্পর্দ্ধা—খোরাক পোষাকের দাবী! ইট, লাঠি, ছোড়া এসব হজম করা যায়, কিন্তু মেয়েছেলের কান্না ভয়ানক অসঙ্গত হলেও একে অবহেলা করা সম্ভব হয় না।

তাই শেষ পর্য্যন্ত সাহস দিয়ে বলে ওঠে "আপনি এখন যান, আমি খোঁজ খবর নেবো। যদি আপনার কথা সত্যি হয় তা হলে আপনার খোরাকপোষাকের একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই

হোয়ে যাবে। তবে কিছু মনে করবেন না—আমরা সবাই ভিখারী, আমাদের আহার্য্য যদি আপনার চলে তো স্বচ্ছেন্দেই গ্রহণ করতে পারেন। আমি হরেনকে ডেকে নিশ্চয়ই খুব বকে দেবো।"

সরল মনে সত্যেন সমস্ত কথাগুলি বোলে চলে যায়—যেন সমস্ত দোষই হরেনের তথা তাদের সকলের।

ভদ্রমহিলা আসার সময় ভেবেছিলেন যে তিনি সত্যেন রায়কে বেশ দুকথা শুনিয়ে দেবেন। এমন কি কোর্টের নজির দেখাতেও ছাড়বেন না। কিন্তু মাঝপথে সত্যেনবাবুর পৃষ্ঠপ্রদর্শনে লড়াইটা তেমন জমে উঠ্‌ল না, তাই আপন দর্পে সশব্দে পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন। কে জানে কি কুটিল উদ্দেশ্য এর মধ্যে লুক্কায়িত ছিল?

এবার মলয় বেশ রাগতভাবে সত্যেনের কাছে এসে বলতে থাকে "কিরে সত্যেন, তুই ওইরকম একটা অপদার্থ মহিলাকে প্রশ্রয় দিলি? আমি সব শুনেছি। তোর মতন আদর্শবাদীর কাছে ওর অপমানই প্রাপ্য ছিল, তা না করে একেবারে সসম্মানে আতিথ্য?"

"দেখ মলয়—ঘৃণিতের সঙ্গ যতই খারাপ হোক না কেন আদর্শবাদীর কাছে বর্জ্জনীয় নয়—সে চায় সকলকে বাঁচাতে ও নিজে বাঁচতে। এবার তোর কি খবর বল।"

সত্যেন ভ্রূকুঞ্চিত কোরে মলয়ের দিকে তাকায়। মলয় ঠিক মতন খুসী হোতে না পেরে যে কাজের জন্য এসেছিল সেই কথা পাড়ে "সত্যেন আমি আর ও স্কুল চালাতে পারব না, যদি তুই আমার কাছ থেকে এই ভারটা তুলে নিস তা হোলে আমি বেঁচে যাই। আমার এমন কোনো দল নেই যে চাঁদা তোলার জন্য লেলিয়ে দিতে পারি। নিজে খোসামুদ করতে করতে হয়রান হোয়েছি, আর সম্ভব নয়। যথেষ্ট দেনা ঘাড়ে পড়ে গেছে। এবার তুই আমায় বাঁচা।"

সত্যেন যেন আকাশ থেকে পড়ে যায়। মনে মনে ভাবে—দেশে এত বড় বড় বিত্তশালী লোক থাকা সত্ত্বেও একটা সামান্য স্কুল বেশ ভাল ভাবে চলে না? বাইরে মলয়কে সাহস দিয়ে বলে ওঠে "আচ্ছা মলয়, আমি যতটা সম্ভব তোকে অর্থসাহায্য পাঠাবো। স্কুল তোমার ছাড়া হবে না। আর হ্যাঁ, তোমার কাজের সাহায্যার্থে আমি রীতাদেবীকে অনুরোধ কোরে দেখতে পারি যদি তিনি তাঁর সুবিধামত কিছুটা সাহায্য করতে পারেন। যে কাজ হাতে করে একবার তুলে নিয়েছ সে কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার ছুটী নেই—বুঝলে!"

মলয় মনে মনে ভাবে, স্বপ্নার কাছে রীতাদেবী কি আর অনুপ্রেরণা দেবে? শুধু কি তাই! আজকাল সংসারের সমস্ত ভাবনাই তার ঘাড়ে এসে পড়েছে। আর এভাবে থাকা চলে

না। অন্নসংস্থান তাকেও করতে হ'বে। স্বেচ্ছাসেবকের বোঝা আর কতদিন বওয়া চলে ?

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে মলয় ফিরে দাঁড়ায়। সত্যেনের কোন কথাই সে অবজ্ঞা করতে পারে না—এমনি তার ব্যক্তিত্ব। নিরোৎসাহে আস্তে আস্তে পা ফেলতে ফেলতে বেরিয়ে আসে। প্রতিবাদ করবার মতন কোন ভাষাই সে খুঁজে পায় না।

ধীর মন্থর ও দীর্ঘসূত্র গতিতে বিচারের প্রহসনের মধ্যে ছোট আদালতের রায় বের হয়ে পড়ে। ঘনীভূত সমস্ত আশঙ্কাই আজ সত্যেনের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। শশী মোড়লের বিচারের তর্জ্জমা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। পুলিস হেফাজতের মধ্যে শশী মোড়লের একবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০০৲ টাকা জরিমানা—অনাদায়ে আরও ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ অর্পিত হয়ে যায়।

সারাদিনের দুর্ভোগ শেষ কোরে সত্যেন আপন সহকর্মীদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ক্লান্ত দেহকে টান্‌তে টান্‌তে আদালত কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে। তখনও বহু পরিচিত অপরিচিতকে আদালতের সীমানার মধ্যে ঘোরা ফেরা করতে দেখা যায়। পাশ দিয়ে হেটে যাবার সময় কে যেন পেসকারী বুদ্ধির তারিফ করতে করতে পানের দোকানের দিকে চলে যায়।

পুঞ্জীভূত ক্লেশের মধ্যেও সত্যোনের হাসি পায়—এদের মামলা মকদ্দমার তদ্বির দেখে।

বাড়ীর সীমানায় পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষুধার জ্বালা বৃদ্ধি পেয়ে ওঠে। আপন কক্ষে প্রবেশ করতে করতেই জামার বোতাম খোলা শেষ হোয়ে যায়। ভিতরে তখনও মলয় একটী আরাম কেদারায় বসে একখানি মাসিক পত্রিকা পড়ে চলেছে। সত্যোনের আগমনে এবার একটু নড়ে চড়ে বসে পড়ে। সত্যোন শুষ্ক মুখেও হাসির রেখা টেনে নিয়ে বলে ওঠে "কিরে মলয়—কখন এলি? একটু বস আমি খাওয়া শেষ কোরে নি।" অভুক্ত সত্যোনের কথা মনে পড়তেই মলয়ও সত্যোনের পিছনে পিছনে আস্তে আস্তে উঠে যায়। খাবার ঘরে সামান্য একটা চেটাইয়ের উপর বসে সত্যোনকে খাবারের তোড়জোড় করতে দেখে চমকে ওঠে। অপরিচ্ছন্ন ভাতের থালাটি যখন বেরিয়ে আসে তখন মলয় নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারে না। "একি সত্যোন, তুই কি আজকাল সমস্ত খরচ বাঁচাতে সুরু কোরেছিস? এরকম খাদ্য খেয়ে কেউ কখনও বাঁচতে পারে? দিন দিন যেন তোর মাথা খারাপ হোয়ে যাচ্ছে—অপরের দুঃখে নিজকেও জোর কোরে এতটা জড়িয়ে ফেলবার চেষ্টাকে আমি মোটেই সমর্থন করি না।"

সত্যোন মলয়ের কথায় বিশেষ কর্ণপাত না কোরে ঠাকুরের

কাছে খানিকটা নুন চেয়ে বসে! অনেক কারসাজির পর যখন ঠাকুর বুঝলো যে বাবুর নুন চাই তখন দেখা গেল যে সময়ের অভাবে নুনটাও আনা হোয়ে ওঠেনি। বাবুর দুরদৃষ্টের কথা জানিয়ে ঠাকুর চুপ কোরে যায়। চাকরবাকরগুলো ক্রমশ আস্কারা পেয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখে ঠাকুরের নিজেরই মাথা চাপড়াতে ইচ্ছে হয়।

এবার ক্রুদ্ধ মনে মলয় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে একে ওকে ডাকা ডাকি স্লুরু করে দেয়। কিন্তু হায়! আগে যেখানে বহুলোকের সাড়া পাওয়া যেত এখন সেখানে একেবারেই মরুভূমি। সমস্ত বাড়ীটার যে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটেছে সে কথা উপলব্ধি কোরে মলয় আবার ফিরে আসে।

এবার মলয়কে শান্ত করার উদ্দেশ্যে সত্যেন বলে ওঠে "আজকাল কেউ তো থাকে না এ বাড়ীতে, মিছে চেঁচামেচি কোরে লাভ কি? এই ঠাকুরটাই যা আমাকে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারে না, ভগবান ওকে কালা কোরে না পাঠালে হয়ত আমার আরও একটু উপকার হোতো—কিন্তু সবই ভাগ্য, মলয়, সবই ভাগ্য!—নইলে আসামীর কাঠগড়ায় এসে বিচার প্রার্থনায় দাঁড়াতে হয়ে ওই বিকলাঙ্গ মানবদূতের কাছে?" কথা শেষ কোরে একটু হেসে নিয়ে সত্যেন খাওয়ার দিকে আবার মনোযোগ দেয়।

বাকরুদ্ধ অবস্থায় মলয়ের দুচোখ বেয়ে কেবল জল গড়িয়ে পড়ে—কোন ভাষাই আর সে খুঁজে পায় না যা দিয়ে এরকম একটী মানুষের প্রশংসা সম্ভব হয়।

খাওয়া যখন শেষ হোল তখন অনেকখানি বেলা গড়িয়ে পড়েছে। ঘরে ঘরে কোমল হস্তের সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালার পালা প্রায় শেষ হোয়ে যায়। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত শঙ্খধ্বনি ক্রমশ মিলিয়ে আসে।

নিশীথের অন্ধকারে দুটী প্রাণ পরস্পরকে জানাবার জন্য ব্যাকুল হোয়ে ওঠে। অন্ধকারের শান্তি ভঙ্গ না কোরেই শোবার ঘরে এসে নরম বিছানার স্পার্শ অনুভব কোরে সত্যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। মলয় সত্যেনের বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে নীরবে ধীরে ধীরে পথে বেরিয়ে আসে। এপথে অনেক বারই সে যাতায়াত করেছে কিন্তু আজিকার যাত্রায় সারাপথের ক্লেশ তাকে শোকাতুর অবস্থায় যেন এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সত্যেনের কঠিন কর্ত্তব্য-বুদ্ধি বারবার তার মনের মধ্যে নাড়া দিতে থাকে।

আজকাল স্কুলে রীতাদেবীর উপস্থিতি স্বপ্না বেশ ভাল চোখে দেখতে পারে না। আর যাই হোক মলয়বাবুর অন্য কোন বান্ধবী তার চোখের সামনে তারই মলয়দার সাথে সহযোগিনী রূপে কাজকর্ম্ম কোরে যাবে এটা একেবারেই অবাঞ্ছিত।

রীতাদেবী কিন্তু মনের মাঝে কোনরূপ সন্দেহ না রেখে বেশ সুস্থ মন নিয়েই স্কুলের দেখাশোনার কাজ কোরে যান। স্বপ্না আগেকার অপেক্ষা এখন যেন স্কুলে আসাটা একটু বাড়িয়ে দিয়েছে--কি জানি কিসের আশঙ্কায়। বাইরের হাবভাব দেখে মনে হয়—মেয়ে হয়ে সে কি কোরে তারই ঈপ্সিত সম্পদ মলয়দার সাথী হিসাবে অপর কোন মেয়ের সান্নিধ্য সহ্য করতে পারে ?

এখন বেশীক্ষণ সময়েই তাকে স্কুলে থাকতে হয়। এর জন্য যদিও একদিকে মলয়ের হাসিমুখের ঠাট্টা আর অপরদিকে মধুকরবাবুর পরিহাস সবই মুখ বুজে হজম করতে হয়।

আজকে কি একটা খাতা নিয়ে রীতাদেবীর সাথে এইমাত্র বচসা হোয়ে গেল। মলয় যদি এসে না পড়তো তা হোলে হয়ত ব্যাপারটা আরও একটু গড়াতে পারতো। স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হিসাব নিকাশ স্বপ্না নিজেই এতদিন রেখে এসেছে। একথা বলা বাহুল্য যে মেয়েদের স্কুল হলেও ছোট ছোট ছেলেদের পড়াশোনার কোন বাধা ছিল না; কিন্তু আজ থেকে সব হিসাবপত্র রীতাদেবী চান যে তিনি নিজেই রাখেন। তাই খাতাগুলো স্বপ্নাদেবীর জিম্মা থেকে সরিয়ে নিতে চান। স্বপ্না রাগত ভাবে বলে ওঠে "তা হোলে আমার আর এখানে

আসার কি দরকার ? যখন কোন ভারই আমার ওপর থাকবে না, তখন—"

রীতাদেবী বলেন "সে কি স্বপ্নাদি, আপনার কাছেই সব থাকবে। তবে দিনের শেষে এগুলোকে একবার মিলিয়ে ঠিক করে দেখে নিতে হ'বে। কোন ছাত্রছাত্রী ঠিক মতন আসছে না সেটাও তো আমাদের বেশ ভাল ভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার ?"

স্বপ্না এবারে বলে ওঠে "তবে এতদিন চলছিল কি করে ?" একথায় রীতা দেবী কি আর উত্তর দিবেন ? তথাপি কিছু বলবার জন্য এগিয়েছিলেন, মলয়বাবুর উপস্থিতিতে এমনিতেই সব ঠিক হোয়ে যায়। হঠাৎ গড়ে ওঠা স্কুলের প্রতি স্বপ্নার দরদ দেখে মলয়ও খানিকটা আশ্চর্য্য হোয়ে পড়ে। এতদিন সে কাজের দায়িত্ব কেবল এড়াতেই চেয়েছে। আজ যে হঠাৎ এরকম হবে এ যেন স্বপ্নেরও অতীত। মনে মনে রীতা দেবীর উপস্থিতিকে প্রশংসা না কোরে পারলে না। রীতা দেবীর উপস্থিতি আজ সমস্ত স্কুলটার যে পরিবর্ত্তন এনেছে-- তার জন্যে মলয় বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। এমন কি স্বপ্নারও যে কর্ম্মচাঞ্চল্য এসেছে এটা মলয়ের কাছে একটা তুর্লভ বস্তু।

সব পাবার পর মানুষের যে আরও কিছু বলবার থাকে সেইটাই মলয় আজ মনে মনে ঠিক করে এসেছে। রীতাদেবীকে

সম্বোধন কোরে বলে ওঠে "দেখুন রীতাদেবী, আপনি সত্যই এ স্কুলের প্রাণদাত্রী, আপনাকে প্রশংসা দিয়ে ছোট কোরতে চাই না। তবে আমার একটা অনুরোধ যে আপনি স্বপ্নাকে একটু মমতা দিয়ে বেঁধে রাখুন, ও বড় অভিমানিনী।"

রীতাদেবী এবার মলয়ের ছেলেমানুষী দেখে সত্যই হেসে ফেলেন, মুখে বলেন "সে কি মলয় বাবু, স্বপ্নাকে তো আমি বোনের মতন স্নেহ করি। তার দোষক্রুটী আমাকে দুঃখ দেয় না—বরঞ্চ বেশ উপভোগ করি।"

মলয় যা বোঝাতে চেয়েছিল সে কথা রীতাদেবী বুঝলেন কিনা জানি না। তবে কথাগুলো বলার শেষে তার মুখের পরিবর্ত্তন দেখে যে কোন ব্যক্তি মলয়ের দুর্ব্বলতাকে সহজেই ধরে ফেলতে পারে—এটা সুনিশ্চিত।

রীতাদেবী ছুটীর শেষে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়েন। মলয় নিশ্চল পাথরের মতন এই মমতাময়ী মেয়েটীর প্রতি মনে মনে অজস্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্যে নিজকে দাঁড় করিয়ে রাখে। এত রূপ নিয়ে পৃথিবীতে এসে এমন সহজ ভাবে চলাফেরা করবার মতন শক্তি ক'জনেরই বা আছে? যৌবনের কি কোন আকর্ষণই তাঁর মধ্যে সাড়া জাগাতে পারে নি?—না—এ তাঁর মৌন সাধনা।

* * *

খাওয়া দাওয়া শেষ করে বেশ মজলিসি ঢং-এ একখানা মাদুর পেতে বোসে দুটি মহিলা চুপি চুপি কি সব জল্পনা কল্পনা কোরে চলেছে। কথার মাঝখানে মাধবী দেবী বলে ওঠেন "না ভাই শোভা দি, আমি জোর করতে পারবো না, বরঞ্চ তাকে বুঝিয়ে বোলে দেখতে পারি। মেয়ের এখন যা মতিগতি হোয়েছে। ভাল কোরে কথাবার্ত্তা কওয়াই মুস্কিল।"

এবার শোভারাণী বেশ টেনে টেনেই বলে ওঠেন "তা—আর —হবে না। এখন যে মলয়দা বলতেই অজ্ঞান! ওই ছোঁড়াটাই তো ওর মাথাটা খেয়েছে, নইলে আগে তো এরকম ছিল না। এখন খালি মলয়দা আর মলয়দা। দেখো বোন, যদি ভাল চাও তো মেয়েটাকে মলয়ের কাছ থেকে সরিয়ে নাও—নইলে পরে পস্তাতে হ'বে এ আমি বলে দিলাম। স্কুল করেছে না গুষ্ঠীর মাথা কোরেছে। দু'দিন পরে কে কোথায় থাকবে তার ঠিক নাই,—যত সব জঞ্জাল নিয়ে নাড়াচাড়া হোচ্ছে।"

অপর পক্ষের বিশেষ উৎসাহ না পেয়ে শোভারাণী এবার নাকি সুরেই বলে ওঠেন "—তা ভাই তোমার মেয়ে, তুমি যা ভাল বুঝবে তাই কোরবে। তবে মেয়েটার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই আমার বলা। আজ যদি দাদা বেঁচে থাকতেন—" কথা শেষ না কোরেই বেশ ফুঁপিয়ে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে থাকেন।

এবার মাধবী দেবী সত্যিই বিপদে পড়ে যান। কি বলে যে সান্ত্বনা দেবেন কিছুই ভেবে ঠিক কোরতে পারেন না। স্বামীর কথায় তাঁরও চোখে জল গড়িয়ে পড়ে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে অস্পষ্ট ভাষায় বলে ওঠেন "না ভাই শোভাদি, আমি তেমন কথা বলছি না, মেয়ে এলে একবার বুঝিয়ে দেখবো। ওর জন্যে কিছু ভেবো না ভাই, যা হোক একটা ব্যবস্থা তো করতেই হ'বে?"

কার পায়ের শব্দে দুজনেই চুপ করে যায়। স্বপ্না বেশ জোরে জোরে পা ফেলে একবার আড়চোখে দুজনকে বসে থাকতে দেখে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে। গতিক খারাপ দেখে শোভারাণীও এবার কাজের অছিলা দেখিয়ে আস্তে আস্তে উঠে সরে পড়ে।

স্বপ্নার বই রাখা শেষ হোতে না হোতেই মায়ের ডাকে বাইরে বেরিয়ে আসে।

মাধবী দেবী এবার বেশ জোর কোরে শুনিয়ে দেন "দেখ স্বপ্না, তোর যত বয়স হোচ্ছে ততই কি বুদ্ধি সুদ্ধি কমে যাচ্ছে নাকি? এখনো কি ওই সব ছাই-পাঁশ স্কুল নিয়ে মেতে থাকার সময়? বলি বয়স বাড়ছে না কমছে? বিয়ে থা কোরতে হবে—না, কেবল হৈ হৈ করে নেচে বেড়ালেই চলবে?"

রীতা দেবীর সাথে বচসার পর থেকে স্বপ্নার মনের অবস্থা তেমন ভাল নেই। এদিকে আবার শোভারাণীর উস্কানী তাকে

আরও ক্ষেপিয়ে তুলেছে। তাই আর সামলাতে না পেরে চেঁচিয়ে ওঠে "না, আমি বিয়ে করবো না—তাতে হয়েছে কি? আমার যখন সময় হ'বে আমি তখন নিজের ইচ্ছামতই বিয়ে কোরবো—কাউকে মোড়লি কোরতে হ'বে না।"

মেয়ের কাছ থেকে এতখানি কখনও প্রত্যাশা করেন নি, এর আগে কখনও মায়ের সাথে স্বপ্না এরকম ব্যবহার করেছে বলে মাধবী দেবীর মনে পড়ে না। শোভারাণী যে মলয়ের কথা বলেছিলেন তা এখনও স্মরণে রয়ে গেছে। আর সহ্য করতে না পেরে দাঁতে দাঁত দিয়ে মাধবী দেবী স্বপ্নাকে বলে উঠলেন "কি! এতবড় আস্পর্দ্ধার কথা? উনি নিজে ভাল মন্দ বিচার করে নেবেন, আমি যেন কেউ নয়, আমি কেবল দাসী বাঁদী! মেয়ের কাছ থেকে আমাকে এরকম কথা শুনতে হ'বে? আজ যদি উনি থাকতেন—" আর কথা শেষ করতে পারেন না, বিপুল কান্না যেন তাঁর গলা চেপে ধরে।

ব্যাপার যে এতদূর গড়িয়ে যাবে তা স্বপ্নাও প্রত্যাশা করে নি। তাই নিজেকে সামলে নিয়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে আবার ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে।

এদেশে মেয়ে হোয়ে জন্মাবার অভিশাপ—বিশেষ কোরে বিবাহ-যোগ্য বয়সের কাছে এসে মাথা উঁচু কোরে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টার এ বিষময় পরিণতি কে রোধ করতে পারে? সে

অভিশাপের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে স্বপ্না বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। কতক্ষণ যে এরকম ভাবে কেটে গেছে তার খেয়াল হয় নি। যখন হুঁস্ হোলো তখন খাওয়া দাওয়ার পালা শেষ হোয়ে গেছে। আজ মা আর মেয়ে বিনা আহারেই ঘুমিয়ে পড়ে।

"শোভা, তোমায় কেন এখন ডেকে পাঠিয়েছি জান?" কথাগুলো এক নিমিষে বোলে সদর্পে টেবিলের ওপর রাখা গেলাসে আরও খানিকটা মদ ঢেলে দিয়ে মধুকরবাবু চোখ বুজে গলাধকরণ করে নেন। মনের আনন্দে বেশ হেলে দুলেই শোভা ঘরের ভিতর প্রবেশ করেছিল, কিন্তু এখন গতিক মন্দ দেখে একটু ইতস্তত: মনোভাবে বলে ওঠে "তা উমেশবাবু, আমি তো চেষ্টার ত্রুটী করি নে।"

এবার মধুকরবাবু চোখ বুজে নেশার ঝোঁকে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দুখানা চকচকে নোট বের কোরে এনে শোভার সামনে মেলে ধরেন। শোভা একটু বিস্মিত ভাবেই নোটগুলো হাতের মধ্যে তুলে নেয়। এত বড় দুটো নোট মধুকরবাবু যে অম্লান-বদনে তাকে দেবে সে মোটেই প্রত্যাশা করে নি। তবে বাবু যে মদের নেশা অপেক্ষা এখন স্বপ্নার নেশায় বিভোর হোয়ে আছেন সে বিষয়ে শোভার আর কোন সন্দেহ রইল না।

মধুকরবাবু জড়ানো ভাষায় বলে ওঠেন "দেখো শো-ভা,

মলয়ের ওপর যে রাগ আমার ছিল,—তার প্রতিশোধকল্পে আমি তার জীবন-হানি করবার চেষ্টাও একবার কোরেছি। আর কি আমার কোরতে হ'বে বলো? আমার মিলের মজুর ক্ষেপিয়ে সত্যেনবাবু যা ক্ষতি করেছেন, মলয় আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হরণ করে তার অনেক বেশী আঘাত দিয়েছে। আমার একমাত্র জীবন ওই স্বপ্নাদেবী, যার রূপলাবণ্য আমাকে একেবারে পাগল করে তুলেছে। প্রেমের অভিধান আমি চিরকাল বন্ধ রেখে বেড়িয়েছি। কিন্তু আজ কি জানি কেন আমার মোহ ছুটে চলে স্বপ্নার পিছু পিছু। কি অদ্ভুত সুন্দর ওই স্বপ্না, কি কোমল দেহ-শ্রী। শোভারাণী, আমার চাই, চা-ই। যে রকমেই হোক আমার চাই ওই সুন্দরী তন্বী।"

এবার ড্রয়ারটা খুলে একটা চকচকে রিভলবার বের করে মধুকরবাবু হাতের মধ্যে নাড়তে নাড়তে সোজা হোয়ে বসে বলতে থাকেন "শোভা, যেন এটার বিষয় স্মরণ থাকে। আর আমি বেশী দিন অপেক্ষা করতে নারাজ। একটা সামান্য মেয়েকে নিয়ে এতদিন খেলা করবার সময় আমার নেই—বুঝলে?"

শোভা অস্ত্রটাকে দেখে শিউরে ওঠে, ভয়ে যেন কাঠ হোয়ে যায়। কোন রকমে সামলে নিয়ে এক নিশ্বাসে বলে ফেলে, "তা আ-মি নিশ্চয়ই—হ্যাঁ—নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো বৈকি।

ও-মাগী যে বড় জেদী ; তাইতো একটু দেরী হোয়েছে। এখন যত শীঘ্র পারি একটা ফয়সলা কোরতেই হবে। আপনি কিছু ভাববেন না—আমি ঠিক তাকে ধরে নিয়ে আসছি ; কেবল আপনি একটু জোর দিবেন, ব্যস।”

কথা কইতে কইতে বাড়ীর ভেতর এক পা কোরে সরে যেতে থাকে। কি জানি যদি হাতের অস্ত্রটা মদের খেয়ালে ছুটে আসে ?

মধুকরবাবু বেশ জোরেই হেসে ওঠেন “হা—হা—হা !”

বাড়ীতে মায়ের সাথে ঝগড়া হবার পর থেকেই স্বপ্নার মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তাই স্কুলের কাজকর্ম্মে বিশেষ মন বসে না। যে ঘরে রীতাদেবী বসে কাজ করেন যাবার পথে স্বপ্না কোন কাজ না থাকলেও একবার নিত্যকার অভ্যাস মত ঘুরে যায়। কিন্তু আজ আর সে ঘরে না ঢুকে সোজা ক্লাসে চলে যায়।

রীতাদেবী মনে মনে ভাবেন—নিশ্চয়ই গত কালের কথা কাটাকাটির জের। তাই স্বপ্নার অবসরে রীতাদেবী স্বপ্নাকে সম্বোধন কোরে গতকালের কথা ভুলে যাবার জন্য অনুরোধ জানান। স্বপ্না কিন্তু সে কথায় কোন কাণ দেয় না। আপন মনে এক খানা বই নিয়ে পড়তে থাকে। রীতাদেবী এবার কাছে এসে

স্বপ্নার মুখ দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যান। মুখ চোখের পরিবর্ত্তন দেখে ভয়ে ভয়ে স্বপ্নাকে রাগ অভিমানের ব্যাপারটা ভুলে যেতে বলেন। স্বপ্না তবুও নীরব। কেবল দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসতে দেখা যায়।

রীতাদেবীর আকুলতা দেখে স্বপ্না চোখের জল মুছে মনের আসল খবরটা অনুশোচনার মধ্যে ধীরে ধীরে প্রকাশ করে ফেলে। সমস্ত অবগত হোয়ে শুধু সমবেদনা দেখানো ছাড়া রীতাদেবীর আর কোন উপায় থাকে না। তবে মধুকরবাবুর ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যায় না দেখে পথের সন্ধানে সত্যেনবাবুর পরামর্শ বা সাহায্যের কথা মনে পড়ে যায়। স্বপ্না প্রথমটা কিছুতেই রাজী হোতে চায় না, কিন্তু অবশেষে রীতাদেবীর সহানুভূতি তার অসহায় জীবনকে অনেকখানি আশ্বাসে ভরিয়ে তোলে। তাই ছুটীর পর দুজেই সত্যেনের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

সত্যেন একলা ঘরে বোসে তার অতি প্রিয় ছোট্ট একটি কুকুর নিয়ে আদর করছিল। এদের দুজনকে আসতে দেখে একটু হাঁক দিয়ে কুকুরটাকে সরিয়ে দিয়ে ত্রস্তভাবে অভ্যর্থনা জানায়—বিশেষ কোরে নবাগতা স্বপ্নাকে। কারণ স্বপ্নার উপস্থিতি সত্যই অপ্রত্যাশিত। এ পর্য্যন্ত ওদের মধ্যে যে আলাপ পরিচয় সে কেবল মলয় আর অন্যান্য পরিচিত লোকের

মারফৎই একটু আধটু হোয়ে আছে। সামনাসামনি বসে আলাপ করবার সুযোগ কখনো ঘটে নি। স্বপ্নার মুখচোখের অবস্থা কিন্তু বেশ ভাল দেখাচ্ছে না—সত্যেনের সেটা আগে থাকতেই লক্ষ্য পড়ে।

কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই স্বপ্নার দুচোখ বেয়ে জল আপনা হোতেই গড়িয়ে পড়ে। আলাপ পরিচয়ের বিশেষ সুবিধা নাই দেখে সত্যেন শুধু অসহায়ভাবে অপেক্ষা করতে থাকে।

অগত্যা রীতা দেবীকেই অগ্রসর হয়ে সব বুঝিয়ে দিতে হয়। মধুকরবাবু আর শোভারাণীর ব্যাপারটা একটু ফলাও করেই বলেন। সত্যেন প্রথমটা যে কি আশ্বাস দেবে কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারে না। শেষে অনেক ভাবনা চিন্তার পর, একটা কিছু ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়ে স্বপ্নাকে বিদায় সম্ভাষণ জানায়।

স্বপ্না রীতাদেবীর সাথে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে। সত্যেন রীতাদেবীকে একটা কাজের কথা ফিরে এসে জেনে নেবার ইঙ্গিত করে। ক্ষণেক পরে রীতাদেবী ও সত্যেন একত্র হোয়ে বসে স্বপ্নার ব্যাপার নিয়ে বিভিন্ন পন্থা অবিষ্কারের উদ্দেশ্যে মাথা ঘামাতে থাকে।

সত্যেন চিন্তিতভাবে বলে ওঠে "দেখুন রীতাদেবী,

আপনাকে একবার সেই ভদ্রলোকের বাড়ী যেতে হবে, অবশ্য চাঁদার ব্যাপার নিয়ে। আর সেই সুযোগে আপনাকে তার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নিয়ে ফিরতে হ'বে।" এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করে আবার বলে ওঠে—"যদি সম্ভব হয় তো কাল সকালেই যাওয়া ভাল,—আর দেরী করা ঠিক হবে না। কারণ শত্রুর সন্ধান পূর্ব্বাহ্লেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।" রীতা দেবীও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে উঠে পড়েন।

কাজটা যে একটু জটিল ধরণের এবং সাধারণ মেয়ের দ্বারা সম্ভব নাও হোতে পারে তা রীতাদেবী মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেন। অন্যায়ের প্রতিকারে তাঁদের যে সকলকেই অনেক নীচে নেমে পড়তে হয়, সেটা আজ নতুন নয়। তাই মনে মনে একবার সত্যেনের পরম ব্যক্তিত্বকে স্মরণ কোরে মনে মনে দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত হয়ে ওঠেন।

সেদিন বিকালে স্বপ্নার স্কুলের সমস্ত কাজকর্ম্ম যেন তাড়াতাড়ি মিটে যায়—স্কুলের ছুটীর ঘণ্টা বেজে ওঠে। ছেলেমেয়েরা যে যার বাড়ী যাবার জন্য হৈ চৈ জুড়ে দেয়। স্বপ্না স্কুলের ছোট বারান্দায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের মাঝে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলে। কি অদ্ভুত হাল্‌কা মনে ছেলেমেয়ের দল কথা কইতে কইতে এগিয়ে চলেছে।

কোন জটিল চিন্তাধারাই এদের জীবনের চঞ্চল ছন্দকে ধরে রাখতে পারে না। এদের সাবলীল গতিতে এরা যেন সদ্যউৎসারিত ঝর্ণাধারা। এরা জানে শুধু স্বচ্ছ নির্ম্মল প্রাণের চটুল ছন্দে ভেসে বেড়ানো। আত্মীয়দের একটু স্নেহই এদের পক্ষে যথেষ্ট। রঙীন সবুজে ঢালা এদের মন। বকেয়া হিসাব এরা কোন দিনই রাখতে জানে না—নতুনের ছোঁয়ায় এরা হোতে চায় মসগুল। এদের মাঝেই সুপ্ত থাকে মানুষের ভগবান—যে ভগবান ঘাত প্রতিঘাতে অভাবের তাড়নায় বাস্তব জীবনে শেষে রূপান্তরিত হোয়ে যায় দানবে।

হায়রে মানুষের সমাজ-ব্যবস্থা। সৃষ্টির মূল নির্মূল কোরে আমরা পেতে চাই জ্ঞানের আলো। আজিকার মানুষ তার কৃত্রিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের বেদীমূলে বলি দিল তার স্বচ্ছ নির্ম্মল প্রাণ। প্রাণ চেয়েছিল পূর্ণতা পরস্পরের মিলনে, পারস্পরিক সহানুভূতিতে। কিন্তু একদিকে অতিমাত্রায় বৈষয়িক লোভ অপর দিকে অভাবের তাড়না সে প্রাণধারাকে অচল করে রেখেছে সমাজের চোরা বালিতে।

এতক্ষণের চিন্তায় স্বপ্নার মোটেই খেয়াল ছিল না যে মলয় পিছনে এসে চুপটি কোরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রেলিংএর সামনে থেকে ফিরে দাঁড়াতেই মলয়ের সাথে চোখাচুখি হয়ে যায়। স্বপ্না ব্যস্তভাবে সরে যাবার চেষ্টা করে কিন্তু

মলয় বাধা দিয়ে সামনে এসে প্রশ্ন করে "কই স্বপ্না, আমার প্রশ্নের উত্তর ত দিলে না? কতদিন আর এ প্রশ্ন করবো? তা হোলে কি বুঝবো—" মলয়ের অধৈর্য্য ভাব দেখে স্বপ্না হেসে ফেলে, কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখ বিষন্ন হয়ে ওঠে। এবার ধীরে ধীরে মলয়ের কথার জবাব দিতে থাকে "না, আমি সে কথা বলবো না। তবে আমার জীবন অভিশাপে ভরা, এক এক বার মনে হয় এ জগতে আমার না আসাই ভাল ছিল। কোন কিছু ভাল বোধ করি আমার সহ্য হয় না, তাই—"

"তবে কি স্বপ্নার স্বপ্ন টুটে গেছে। এবার শুধু বিদায় দেওয়ার পালা?"

মলয়ের কথা শুনতে শুনতে স্বপ্না এক পা এক পা কোরে এগিয়ে চলছিল;—এবার থেমে একটু গম্ভীর হোয়েই উত্তর দেয় "দেওয়া নেওয়া ব্যাপার তো অনেক দিনই মিটে গেছে, তবে পুরাণো কথায় মনে দুঃখ দিয়ে লাভ কি? পুরুষরা যে পুরাতন রীতি অনুযায়ী এখনও মেয়েদের অবিশ্বাস করে—তা জানি, কিন্তু তাই বলে সকল ক্ষেত্রেই আঘাত করা সাজে না।".

একটা মুখের মত জবাব দেবার আগ্রহে মলয় মুখ ফেরাতেই চম্‌কে ওঠে। আর কিছু বলা হয় না।

স্বপ্নার চোখের কোণে জল দেখে মলয় তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে "না স্বপ্না, আমি তোমাকে কোন দিনই অবিশ্বাস করিনে। তবে মাঝে মাঝে নানা আশঙ্কা আমাকে ঘিরে ধরে। কি জানি—পাছে তোমায় পেয়েও হারাতে হয়। কেন এমন হয় স্বপ্না?" একটু চুপ করে থেকে আবার বলে চলে "আমি আমার মন দিয়ে যত দূর জানি তাতে আমাদের ভালবাসায় বিচ্ছেদের কোন স্থান নেই। তবুও কেন এত সন্দেহ—এত আশঙ্কা?"

স্বপ্না এবারে একটু মুচকে না হেসে থাকতে পারে না—"সব জিনিষেরই বেশীর মধ্যে গোলমাল, বুঝলেন? অল্পে সন্তুষ্ট থাকাই ভাল।"

এতক্ষণ বাইরের আবহাওয়া নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার ছিল না। এবারে অফিস ঘরে প্রবেশ করে মলয় ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা করে "রীতাদেবীকে তো দেখছি না?" রীতাদেবীর নামেই স্বপ্নার মেজাজ খারাপ হোয়ে যায়; মুখ ভার কোরে বলে ওঠে—"না, তিনি আজ আসেন নি; তাঁকে খুব বেশী প্রয়োজন নাকি?"

স্বপ্নার ইঙ্গিতে মলয় ব্যথিত হয়। অনেকবার অনেকক্ষেত্রে তাকে এরকম, সন্দেহের মধ্যে পড়তে হোয়েছে, আজ আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না—"পুরুষরা তো পুরাতনকে

আঁকড়ে থাকে, কিন্তু মেয়েদেরও যে একটু দৃষ্টি-প্রসারের প্রয়োজন হোয়ে পড়েছে স্বপ্না—সে দিকে মেয়েরা নজর দেবার বালাই রাখে না। পুরুষদের একতরফা সমালোচনায় নিজেরা সব সময় ডুবে থাকবে—এটাই কি বরাবর চলতে পারে, স্বপ্না ?"

স্বপ্না তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলে ওঠে "তা হোলেও কি আপনি বল্‌তে চান—অবাধ মেলামেশায় পুরুষদের কি মেয়েদের কিছুই যায় আসে না ?"

মলয় তেমনি গম্ভীর হোয়েই বোলে চলে "কি যায় আসে সেটাই বড় কথা নয়। কি হারায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা আরও প্রয়োজন। মেলামেশা মানেই যে 'প্রেম, ভালবাসা'—এরূপ অর্থ যাঁরা করেন, তারা যে ভ্রান্ত সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। পাত্র পেলেই পাত্রস্থ হোয়ে পড়বে এটা ভাবা অন্যায়। অবশ্য সকল ক্ষেত্রে সমান না হোলেও পরিচয় আর প্রেমের স্বরূপ এক নয়।"

এবার স্বপ্না একেবারেই চুপ কোরে যায়। মলয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে অন্তরের ভাষা খোঁজার চেষ্টা করে। মলয়ও বেশ শান্ত মনে স্বপ্নাকে কাছে টানার চেষ্টা করে "স্বপ্না, তুমি বিশ্বাস করো—আমি তোমায়—" কথা আর শেষ হয় না, স্বপ্না তাড়াতাড়ি মলয়ের মুখ চেপে ধরে। অনেকবার মলয়ের মুখে এ কথা শুনেছে। কিন্তু এখন নানা চক্রজালে সমস্ত যেন অবাস্তব

বলে অনুভব করে। চরম মুহূর্তের প্রত্যাশায় এখন দিন গোনা ছাড়া কোন উপায় নাই। মলয়ের পিতার 'বাৎসরিক কাজ' শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চুপ কোরে বসে থাকতে হবে। এটা সামাজিক বিধি, একে মানতেই হবে।

*　　　*　　　*

আজকের ভোরের আবহাওয়া সত্যই বড় মনোরম। চারিদিক কুয়াসায় ঢেকে রয়েছে, গাছের ওপরদিকটা প্রায় দেখাই যায় না। শিশিরে ভেজা মধুমালতার ফুলগুলো যেন আবছা আলোয় উঁকি ঝুঁকি মারে।

স্পষ্টতার মধ্যে এমন একটা রূঢ়তা—একটা চৌহদ্দি-চিহ্নিত সীমাবদ্ধতা আছে যা কল্পনাকে তেমন আমল দিতে চায় না। কুহেলি বা কুয়াসা-ঘেরা আবছা আবহাওয়ার অস্পষ্টতায় কল্পনা পাখা মেলে দিগ্বিদিকে উড়ে যেতে পারে। তাই কুয়াসার পরিবেশ একটা জাগ্রত স্বপ্নের মত। বাস্তবের রূঢ়তাকে গ্রাস করে সে বাস্তবকে কল্পলোকের দুয়ারে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। সমস্ত পৃথিবীর লজ্জা-গ্লানি কুয়াসার আস্তরণে ঢেকে গিয়ে ধরণী যেন অপরূপ হয়ে ওঠে।

মধুকরবাবুর বাগানবাড়ীটা কুয়াসায় ঢেকে রয়েছে। ঢুকবার রাস্তাটা যেন চেনাই যায় না। রীতাদেবী আস্তে আস্তে পা ফেল্‌তে ফেলতে এগিয়ে চলেছেন। একবার থমকে দাঁড়িয়ে

আজিকার প্রকৃতির কুয়াসার সমারোহকে প্রাণ ভরে উপভোগ করে নেন। চিরন্তন যৌবনকে কুয়াসার আড়ালে নিজে নিজেই উপলব্ধি করেন। এতদিনের কর্ম্মব্যস্ততায় যাকে চিনে নেবার সুযোগ হোলো না—আজ সে আপনা হোতেই যেন তাকে ধরা দেয়। অদ্ভুত এই প্রকৃতি।

রীতাদেবী বেশ সাহসভরে আস্তে আস্তে এগিয়ে যান। ভেতর থেকে সব দরজা জানালা এমনভাবে বন্ধ—দেখলে মনে হয় না যে উপস্থিত কোন লোক এ বাড়ীতে বসবাস করে। রীতাদেবী সাবধানে দরজার কড়া নাড়তে থাকেন। দরজাটা খুলে যায়। একটী লম্বা টিকিওয়ালা পৈতেধারী লোক বেরিয়ে আসে। চোখ মুখের রকম দেখলে মনে হয়—বুঝি কোন যমদূতের সহচর। রীতাদেবীকে আপদমস্তক নিরীক্ষণ কোরে বেশ বড় বড় চোখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করে "কাকে চাই?" বেশ স্বচ্ছন্দ হওয়ার চেষ্টা সত্ত্বেও রীতাদেবীর শরীর কিন্তু আতঙ্কে শিথিল হয়ে পড়ে। রীতাদেবী বাড়ীর মালিকের খোঁজ করেন। লোকটা লম্বা লম্বা পা ফেলে দুরন্ত আদব কায়দায় রীতাদেবীকে অভ্যর্থনা কোরে ভেতরে নিয়ে যায়।

বাহিরের পরিচয় পেয়ে ঘরের মানুষটীর সম্বন্ধে অনেক রকম-ভাবে গবেষণা করতে করতে রীতাদেবী একটা সাজানো কোচে বসে পড়েন। হঠাৎ একটা ঘণ্টার আওয়াজে চমকে ওঠেন।

দেওয়ালে টাঙানো বিরাট ঘড়িটাতে আধঘণ্টার সময় ঘোষিত হয়। সময় যতই গড়িয়ে যেতে থাকে ততই মনে আতঙ্কের কুয়াশা জমাট বাঁধতে থাকে। এত বড় বিরাট থামওয়ালা বাড়ীটাতে অদ্ভুত কত-কিছু ঘটতে পারে তারই বা ঠিক কি?

কিছুক্ষণের মধ্যেই মধুকরবাবু হাসতে হাসতে এগিয়ে আসেন। প্রথম ভাবনায় লোকটার পরিচয় যা মনে হয়েছিল এখন কিন্তু দেখলে তা মনে হয় না। বেশ শান্ত অথচ ধীর পদক্ষেপে রীতাদেবীর সামনা সামনি এসে একটা চেয়ারে বসে পড়ে। রীতাদেবী এবার কোন ভূমিকা না কোরেই সোজা চাঁদার কথা তোলেন।

চাঁদার নাম শুনে অনেকেই প্রথমটা একটু চমকে ওঠেন। কিন্তু মধুকরবাবুর মধ্যে তেমন কোন ভাব মোটেই লক্ষ্য পড়ে না। উপরন্তু বিনয় সহকারে চাঁদার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বেশ সাগ্রহে শুনতে চান। রীতা দেবী গ্রামছাড়া দেশছাড়া দুঃস্থ নরনারীর সম্বন্ধে এক বিরাট বক্তৃতা দিয়ে চাঁদার অঙ্কের কথা জিজ্ঞাসা করেন। মধুকরবাবু এতক্ষণ রীতাদেবীকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করতেই ব্যস্ত ছিলেন, এবার বেশ সন্তুষ্ট মনে নামটা জেনে নেবার চেষ্টা করেন। রীতা দেবী কোনরূপ কার্পণ্য না দেখিয়ে সোজা নিজের নামটা জানিয়ে দেন; ও পরক্ষণেই মধুকরবাবুর নাম বেশ হাসি মুখেই জিজ্ঞাসা করেন।

মধুকরবাবু অচেনা ভেবেই নিজের নামটা গোপন করেন। রীতা দেবীর নামের সাথে মিল রেখেই বলে ওঠেন—"এই দেখুন, আমাকে অনেকে অনেক রকমে ডাকে; আমার আসল নাম সুরজিত সেন।" কথায় কথায় রীতা দেবীকে আরও খানিক ক্ষণ অপেক্ষা করানোর জন্যই এবং মেয়েটীর আসল সন্ধান বের করার উদ্দেশ্যেই চাঁদা দিতে দেরী করতে থাকেন।

রীতা দেবী নিজের বিপদের কথা এতক্ষণ স্মরণেই আনতে পারেন নি; এখন দেরী হোতে থাকায় বেশ জড়সড় হোয়ে ঘামতে থাকেন। মধুকরবাবু এবার ক্রমশই রীতা দেবীর এখানে আসার উদ্দেশ্যের কথা ভাবতে থাকেন; চাঁদা আদায়ের ছলনায় বড়লোকের দুয়ারে ঘোরাফেরা করতে তো অনেককেই দেখেছেন, কিন্তু এত সুন্দরী যুবতীকে তো আর কখনো দেখেন নি—সত্যি কি চাঁদার ব্যাপার—না অভিসার?

মুখ ফেরাতেই লক্ষ্য পড়ে যায় কে একটী মেয়ে জানালার পাশ দিয়ে অন্য দিকে চলে যায়। রীতা দেবী বেশ বুঝতে পারেন সে মহিলাটী কে? এই তো সেই মহিলা যে একদিন নানা ছলনায় তাদের সংগঠনীতে গিয়ে সত্যেনবাবুকে অপমান করবার সুযোগ নিয়েছিল। এ কি কোরে এখানে এল? তবে কি সুরজিতবাবু অন্যায়ের পর্য্যায়ে নিজেকে ভাল রকমেই জড়িয়ে ফেলেছেন? আর ভাবতে পারেন না, এবার মধুকর-

বাবুকে সম্বোধন কোরে নিজের অসুস্থতার কথা জানিয়ে চাঁদা বাকী রেখেই উঠে পড়েন।

রীতা দেবী যখন বাইরে এসে চোখ চাইলেন তখন তাঁর সর্ব্বশরীরে যে শিহরণ দিল তা বোধ হয় একা একা বিপদের মুখে কোন নারীকে না দেখলে ঠিক অনুমান করা সম্ভব হয় না। বৃষ্টিতে ভিজে গেলে ওই রকমের মহিলাকে যে রকম দেখতে লাগে রীতা দেবীরও ঠিক সেই অবস্থা। পরিধানের ঢাকায় সমস্ত দেহের সৌষ্ঠব এতক্ষণ প্রকাশ পায় নি, কিন্তু এখন সে-গুলি ভিজে দেহের প্রতিটা জায়গাকে পরিস্ফুট কোরে তুলেছে।

* * *

মাধবী দেবী নিজের জেদ বজায় রাখতে গিয়ে চরম বিপদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। শোভারাণী আজ সকালেই মধু আহরণের উদ্দেশ্যে স্বপ্নাকে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশায় বেশ জেদ্ কোরেই বসে রয়েছেন। মাধবী দেবী স্বপ্নাকে আজ বিশেষ ভাবে সাজ গোজ কোরে যাবার জন্যে প্রথমটা অনুনয় করলেন। তারপর জোরে জোরে হুকুম চালিয়ে দিলেন।

স্বপ্না মধুকরবাবুর বাড়ীতে মায়ার সাথে দেখা করতে অনেকবারই গেছে। কিন্তু আজকের দিনটির মধ্যে একটা বিশেষ আশঙ্কার আভাস তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মাথার চুল ঠিক করতে-করতে কি মনে কোরে বালিশের নীচে

থেকে একটা ছবি বের করে আনে। ছবিটার দিকে স্বপ্না এক-দৃষ্টে তাকিয়ে দেখে—এই তো সেই ছবি যে ছবিতে মলয়ের বাম পার্শ্বে স্বপ্না বেশ প্রফুল্ল মনেই বসে রয়েছে। তবে কি এ ছবি নিছক ছবি হয়েই থাকবে? স্বপ্নার মনে সহস্র প্রশ্ন এক সঙ্গে ভিড় করে আসে। স্বপ্না স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবতে থাকে।

মায়ের তাগিদে এবার স্বপ্না তাড়াতাড়ি সাজগোজ কোরে বেরিয়ে পড়ে। যাবার পূর্ব্বে মাকে প্রণাম করার সময় মাধবী দেবী ছল ছল চোখে স্বপ্নার হাত ধরে কাছে বসিয়ে নিজের গলার হারটী খুলে পরিয়ে দেন। মা ও মেয়ের চোখের জল কেবল হতভাগা জীবনকে ভৎ‍র্সনা জোগায়; মেয়ের উপর মায়ের কর্ত্তব্য এখন পিতার মতন কাঠিন্যে ভরা। শোভারাণীর দিকে অসহায়ের মত চেয়ে মাধবীদেবী যেন সহানুভূতি যাচ্ঞা করেন—বিদায়ের আশীর্ব্বাদে এদের যাত্রাকে ভরিয়ে তোলেন।

মধুকরবাবু বেশ তৈরী হোয়েই বসেছিলেন, আজ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেন। জীবনে কোনদিন কোন মেয়ের কাছ থেকে বিমুখ হোয়ে ফিরতে হয়নি—আজ একটা সাধারণ মেয়ে তাঁকে এভাবে অবজ্ঞা কোরে চলে যাবে এ একেবারেই অসহ্য। তাঁর নিজের সংকল্প সম্বন্ধে ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্যের বিচার একান্তই অনাবশ্যক। পাপ-পুণ্য সমাধানের অনেক উপরেই তার

স্থান ; সমস্ত পৃথিবীই যখন তার নেশার কবলে, তখন তার অগ্রগতি রোধ করবে কে ?

স্বপ্নার আগমনের পালা বেশ শান্ত ভাবেই সারা হোয়ে যায়। গোলমাল বাঁধে যখন স্বপ্না আর অপেক্ষা না কোরে বাড়ী ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।—মধুকরবাবু এবার নিজ মূর্ত্তি ধারণ করেন। নেশার মাত্রা ইচ্ছে করেই আজ একটু বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। টল্‌তে টল্‌তে জীবন্ত পিশাচের মতন স্বপ্নার সামনে এসে দাঁড়ান। তৃষিত প্রাণের পিপাসা আজ মিটবেই। স্বপ্না প্রথম দর্শনে যে তেজ সঞ্চয় করেছিল ক্রমে ভয়ের ক্লান্তিতে তা অবসন্ন হোয়ে পড়ে।—হাতের কাছে বাধা দেবার মতন কোন অস্ত্রই সে খুঁজে পায় না। মুখের ভাষাও আজ ফুরিয়ে গেছে।—টেবিলে ধাক্কা খেয়ে মধুকরবাবুর পকেট থেকে কি একটা চক চকে অস্ত্র পড়ে যায়। সেদিকে কারুরই ভ্রূক্ষেপ নাই।

এবার দুজনের মাঝে রীতিমত ধ্বস্তাধ্বস্তি হোতে থাকে।—দুর্ব্বল নারী কতক্ষণ আর সে চাপ সহ্য করতে সমর্থ হয় ? পুরুষের চরম চাহিদায় তাকে আজ অবনত হোতেই হ'বে—সুস্থ দেহে না হোলেও, আঘাতের বিনিময়েও তাকে হার স্বীকার করতেই হ'বে। হঠাৎ টেবিলের কোণটা মাথার সঙ্গে ঠুকে স্বপ্না অজ্ঞান হয়ে যায়।—তারপর সমস্ত পৃথিবীর অভিশাপ আজ তার ওপর নেমে আসে।

স্বপ্নার দেরী মাধবীদেবীকে বিশেষ ভাবে চঞ্চল কোরে তোলে। অজানা আশঙ্কায় তার সর্ব্বশরীর কাঁপতে থাকে। হঠাৎ যেন কিসের ছোঁয়ায় শোভারাণীর অভিনয়ের পর্দ্দা মন থেকে একমুহূর্ত্তে সরে যায়। স্নেহের আবরণে দেখা দেয় রাক্ষুসী পরিকল্পনা। মাধবীদেবী কোন রকমে নিজেকে খাড়া রেখে অমলকে দিয়ে মলয়ের খোঁজ করে পাঠান। মলয় অমলের চোখ-মুখের ভঙ্গীতে মনে মনে বিপদ গনতে গনতে তড়িৎবেগে ঘর থেকে ছুটে আসে।

মাধবীদেবীর কাছে ইতিবৃত্তান্ত সব শুনে মলয় অত্যন্ত চঞ্চল হোয়ে ওঠে। হঠাৎ বিপদে মানুষ যে রকম দিশেহারা হোয়ে যায় মলয়েরও ঠিক সেই অবস্থা। তবুও একবার স্কুলে স্বপ্না ফিরেছে কিনা জানবার জন্য মনটা ছটফট্ করে। স্কুলে এসে রীতাদেবীর সাথে তার কয়েকমিনিটের কথাবার্ত্তায় সব পরিষ্কার হোয়ে যায়। উপায়ান্তর না দেখে মলয় প্রাণপণে ছুটতে থাকে। কি জানি এতক্ষণে কোন বিপদ ঘটে গেল কি না? রীতা দেবী আর স্থির থাকতে পারেন না, পথে পুলিশকে খবর দিয়ে সত্যেনের কাছে ছুটে যান। সত্যেনও রীতা দেবীর কথা শুনে আর কালক্ষেপ না কোরে কোনরকমে গায়ে একখানা পাঞ্জাবী চড়িয়ে দিয়ে জুতাটা টানুতে টান্তে বেরিয়ে পড়ে।

প্রবেশের মুখেই হঠাৎ রিভলবারের আওয়াজে মলয় চমকে ওঠে। পা দুটা আরও জোরে চালিয়ে দেয়—এ কি? মধুকরবাবু রক্তাক্ত কলেবরে দালানের মেজেতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। অপর দিকে চোখ ফেরাতেই স্বপ্নার মূর্ত্তি দেখে মলয় রীতিমত আঁৎকে ওঠে। মলয়কে দেখে স্বপ্না হাতের রিভলবারখানা নাড়তে নাড়তে বলতে থাকে "সামনে থেকে সরে যাও, আমি আবার গুলি ছুঁড়বো। এমন গুলি ছুঁড়বো যা কেউ কখনো কল্পনা করতে পারে নি—হিঃ—হিঃ—হিঃ।"

স্বপ্নার চুলগুলি এলোমেলো ছড়িয়ে পড়েছে। চোখে তার জিঘাংসার লেলিহান শিখা। স্বপ্না আজ শক্ত হাতের মুঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মলয় নিজকে সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে স্বপ্নার কাছে এগিয়ে যায়। তারপর স্বপ্নাকে আদর কোরে বলে ওঠে "স্বপ্না, আমি মলয়, তুমি চিনতে পারছ না? চল, বাড়ী যাবে চল।" স্বপ্না চোখ দুটি বেশ ভাল কোরে মেলে ধরে ঘাড়টাকে একপাশে হেলিয়ে দিয়ে মলয়কে নিরীক্ষণ করতে থাকে—যেন কত অজানা! ক্ষণেকেই আবার সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে জোর করে হেসে ওঠে "হা—হা—হা!"

একি বীভৎস হাসি! যেন থামতেই চায় না। এ হাসি শুনে মলয়ের দম যে বন্ধ হোয়ে আসে। মলয় কেবল

নির্ব্বাক পুতুলের মতন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। স্বপ্না এবার আপন মনেই বলে ওঠে—"ও, তুমি বুঝি মলয়! তুমি দাঁ-ড়ি-য়ে রয়েছ; আমাকে বুঝি ভালবাসার কথা—" বলার সাথে সাথে রিভলবারটা হাত থেকে খসে পড়ে যায়।

স্বপ্নাকে পতনোন্মুখ দেখে মলয় তাড়াতাড়ি ধরে ফেলে। কি বলবে কিছুই ভেবে পায় না। যে নিজেই প্রকৃতিস্থ হোতে পারে নি, অপরকে প্রকৃতিস্থ করবার ক্ষমতা তার কেমন করে হবে? স্বপ্নার বিষয় মলয় আর ভাবতে পারে না—সব যেন গুলিয়ে যায়, সাধারণ মানুষের পর্য্যায় থেকে স্বপ্না এখন অনেক খানি সরে গেছে। বাস্তবের সাথে বরাবরের জন্যেই তার পরিচয়ে যেন একটা ছেদ পড়েছে।

এবার সত্যেন ও রীতাদেবী একসাথে প্রবেশ করে। স্বপ্নার অবস্থা দেখে দুজনেই নির্ব্বাক হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ উপরের ঘর থেকে একটা গোঙানির শব্দ ভেসে আসে। সকলেই সচকিত হোয়ে ওঠে। সত্যেন ও মলয় দুজনেই ছুটে ওপরে উঠে যায়।—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! মেজেতে বিশাল শরীর নিয়ে শোভারাণী ছটফট করছে। একটু পরেই সব শেষ। শোভারাণীর ইহলোকের খেলা সাঙ্গ হোয়ে যায়!

পাশে দণ্ডায়মান মেয়েটী কি নিষ্ঠুর ভাবে জোরে জোরে হেসে ওঠে ও পরক্ষণেই কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না কোরে বলে

ওঠে "কি হতভাগী, আমায় পাগল সাজাবেই ?—এবার তোমার শেষ পুরস্কার পেয়েছো তো ?"

এতক্ষণে পুলিসের লোকজন এসে দরজার সামনে দাঁড়ায়। এদের সকলকে লক্ষ্য করেই মেয়েটী এগিয়ে আসে "আমিই এই ডাকিনীটাকে হত্যা করেছি।—আমাকে দিয়েও এর সর্ব্বনাশ করার আশা মেটে নি। আমি পাগলও নই—মাতালও নই। আমায় 'মায়া' নাম দিয়ে এতদিন এরা পাগল সাজিয়ে এসেছে—নিজেদের কার্য্য সিদ্ধির জন্য। আমার আসল নাম 'তপতী'।—হতভাগ্য জীবনকে আশ্রয় কোরে বাঁচবার সকল পথ আজ সবারই পরিষ্কার হোয়ে গেছে।"

পুলিসের লোকজন লক্ষ্য করে নিরুদ্বেগেই বলে ওঠে "এবার আপনারা আমাকে নিয়ে যেতে পারেন।—তবে যাবার আগে আমি একটী মানুষকে প্রণাম জানাই।" একটু থেমে সত্যেনের কাছে এগিয়ে এসে নত মস্তকে প্রণাম করে। সত্যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে কেবল চেয়ে থাকে—কোন কিছুই বলা হয় না।

নীচে থেকে আবার কিসের যেন একটা শব্দ শোনা যায়। রীতাদেবী এবার বেশ জোরে জোরেই চেঁচিয়ে ওঠেন। ভয়ে মলয় আর সত্যেন ছুটতে ছুটতে নীচে নেমে আসে। রীতাদেবী পাগলের মত কেঁদে ওঠেন। তারপর বাহিরের বারান্দা থেকে

নীচের দিকে চেয়েই সকলে অবাক্ হোয়ে যান। স্বপ্নার দেহ কুণ্ডলী পাকিয়ে রাস্তার উপর পড়ে রয়েছে।

মলয় বিহ্বল দৃষ্টিতে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসে। কাছে এসে—স্বপ্নাকে পাগলের মতন জড়িয়ে তুলে ধরে ;— ডাক্তারের খোঁজে একবার চেঁচিয়েও ওঠে। কিন্তু সব ঠাণ্ডা। কে কার ডাকে সাড়া দেবে ?—যে দেবে সে আর ইহ জগতে নাই—। অনাদৃত চিরলাঞ্ছিত জীবন এভাবে শেষ করা ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পারে ? প্রিয়তমের কাছে সন্দেহের আকর হোয়ে বেঁচে থাকার লজ্জা সে এড়িয়ে গেছে।

সত্যেন চোখের জল মুছে খুব কাছে এসে মলয়ের কাঁধ ধরে দাঁড়ায়। মলয়ও অশ্রুপ্লাবিত মুখে সত্যেনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল কোরে তাকিয়ে থাকে। সত্যেন এবার বেশ আস্তে আস্তে বলে ওঠে "মলয় ভাই, অন্তরের খেলা শেষ হোয়েছে। অনেক চেষ্টাতেও নিয়তিকে লঙ্ঘন করা সম্ভব হোলো না। এবার আমার যাবার ডাক এসেছে।" শেষের কথায় মলয় যেন আকাশ থেকে পড়ে যায়। সত্যেন এবার আরও খানিকটা সংযত হোয়ে বলে ওঠে—"সে ডাক নয় ভাই, সে ডাক নয়। এ ডাক পৃথিবীর অজস্র নরনারীর। যাদের দুঃখ মোচনের জন্য এতদিন কেবল লড়াই কোরে এসেছি আজ তারই একটা সূত্রে আমাকে জেলখানায় যেতে হ'বে। পুলিশ তার কর্তব্যে কখনও

অবহেলা করে না। এক সঙ্গে যখন দুটো কাজই সারা চলে, তখন এঁরা এখান থেকেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। কোন দুঃখ করিস্ নে ভাই, তোকে সান্ত্বনা দেবার মতন আমার কিছুই অবশিষ্ট নাই—তবুও বলে যাই—মানুষ সহস্র বিপর্য্যয়ের মুখেও বাঁচবার জন্যেই এখানে এসেছে—একথাটি স্মরণ কোরে আমাদের শুধু সামনের দিকেই এগিয়ে যেতে হ'বে ভাই। বসে কাঁদলে তো চলবে না।"

মলয় প্রস্তর মূর্ত্তির মত সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। জুতোর খট্ খট্ শব্দের মাঝে মুখ দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে—স্বপ্না—স্বপ্না—স্বপ্না!

(সমাপ্ত)

গ্রন্থকারের আর একখানি

উপন্যাস

স্মৃতি

অভিনব ভঙ্গীতে—সম্পূর্ণ নূতন আঙ্গিকে লিখিত

শান্তি ও বীরেনের দেহাতীত প্রেমের

চিত্তাকর্ষক আখ্যায়িকা,

ইতিমধ্যেই বহুজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা

অর্জ্জন করিয়াছে।

দাম—দুই টাকা মাত্র